POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (النساء:145)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ কর্তৃক খোলাখুলি অভিযোগ আনার সুযোগ দিতে চাহ?

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৪৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 5

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

4 ফেব্রুয়ারী, 2021 ● 21 জামাদিউস সানি 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সূর্যগ্রহণে সদকা প্রদান

১০৪৪) হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) লোকেদের নামায পড়ান। তিনি দন্ডায়মান হন এবং দীর্ঘক্ষণ দন্ডায়মান থাকেন। অতঃপর তিনি রুকুতে যান, দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকেন। এরপর দাঁড়ান এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর এই কিয়াম পূর্বের কিয়ামের থেকে কম ছিল। এরপর তিনি রুকু করেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকেন। এই রুকু পূর্বের রুকুর থেকে কম দৈর্ঘের ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকেন। এরপর দ্বিতীয় রাকাতেও তিনি এমনটি করেন যেমনটি প্রথম রাকাতে করেছিলেন। এরপর তিনি যখন নামায পড়ে বেরিয়ে আসেন, সূর্য তখন পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। তিনি লোকেদের সম্বোধন করে বললেন: সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনগুলির মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু কিম্বা জন্মের কারণে এদের গ্রহণ লাগে না। কাজেই তোমরা যখন গ্রহণ দেখো, তখন আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর, তাঁর মহত্ব ঘোষণা কর, নামায পড় ও সদকা কর। এরপর তিনি বলেন: হে মহম্মদের উম্মত! খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা অপেক্ষা কেউ আত্মাভিমানী নয় যে তার দাস বা দাসী ব্যাভিচার করবে। হে মহম্মদের উম্মত! আল্লাহ্‌র কসম! যা কিছু আমি জানি যদি তা তোমরা জেনে যাও, তবে তোমরা হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

(বুখারী, ২য় খন্ড, কিতাবুল কুসুফ)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত,২৫ ডিসেম্বর ২০২০ হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর চ্যালেঞ্জ

আল্লাহর কি মহিমা! কি মহান শ্রেষ্ঠত্ব! রসূল করীম (সা.)-এর কারণে এক অনন্য বিপ্লব ও অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিনি হুকুকুল ইবাদ ও হুকুকুল্লাহ্‌র নিখুঁত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মৃতভক্ষণকারী এক নিষ্প্রাণ জাতিকে উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ সম্পন্ন এক প্রাণবন্ত ও পবিত্র জাতিতে পরিণত করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বার্তা

সংস্কৃত ও এই গোত্রের ভাষাগুলি মৃতপ্রায়। এগুলির না আছে কোন সাহিত্য রচনার ধারা না আছে অন্য কিছু। অনুরূপ অবস্থা খৃষ্টানদের, তাদের ইঞ্জিলের প্রকৃত ভাষার দিকে মনোযোগই দেয় নি। .. আমি আশ্চর্য হই যে কি তবে কি কারণে ইসলামের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ? ইসলামের খোদা কোন কল্পিত খোদা নন। বরং তিনিই সেই সর্বশক্তিমান খোদা যিনি আদি ও অনাদি কাল থেকে অপরিবর্তনীয়। এরপর নবুয়তের বিষয়টি দেখ যে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

প্রথমত, রসুল প্রয়োজনের সময় আসেন অতঃপর সেই প্রয়োজনকে সর্বোত্তম পন্থায় পূর্ণ করেন। কাজেই এই সম্মানও আমাদের নবী করীমই (সা.) লাভ করেছেন। রসূল করীম (সা.) যখন আবির্ভূত হলেন, তখন আরব তথা জগতের অবস্থা কিরূপ ছিল তা কারো অজানা নয়। সে যুগের মানুষ ছিল বর্বর ও পশুতুল্য, যারা পানাহার ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। তারা মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার কিম্বা আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের অধিকার, সব কিছু থেকেই ছিল অজ্ঞ ও উদাসীন। এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা তাদের অবস্থার চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে বলেছেন- يَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (মহম্মাদ: ১৩) । কিন্তু তার পর রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা তাদের উপর এমন প্রভাব ফেলল যে, তাদের অবস্থা হয়ে উঠল- يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (আল ফুরকান: ৬৫) অর্থাৎ তারা নিজ প্রভুর স্মরণে তাদের রাতগুলি সিজদাবনত হয়ে এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় অতিবাহিত করত। আল্লাহর কি মহিমা! কি মহান শ্রেষ্ঠত্ব! রসূল করীম (সা.)-এর কারণে এক অনন্য বিপ্লব ও অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিনি হুকুকুল ইবাদ ও হুকুকুল্লাহ্‌র নিখুঁত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মৃতভক্ষণকারী এক নিষ্প্রাণ জাতিকে উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ সম্পন্ন এক প্রাণবন্ত ও পবিত্র জাতিতে পরিণত করেছেন।

উৎকর্ষের দুটি রূপ থাকে: বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক। ব্যবহারিক অবস্থার কথা বলতে গেলে তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (আল ফুরকান: ৬৫)। আর বৌদ্ধিক অবস্থা তাদের অসংখ্য লেখনীর ধারা এবং ভাষা প্রসারের জন্য নিরলস সেবা থেকে অনুমেয় যা তুলনাহীন।

অপরদিকে খৃষ্টানদেরকে দেখে আমি আশ্চর্য হই যে যে, ঈসা (আ.)-এর শিষ্যরা খৃষ্টান হয়ে কি উন্নতি করল? ঈসা (আ.)-এর খাজাঞ্চি ইহুদা ইসক্রিউতি কখনও সখনও সম্পদ আত্মসাৎও করত। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, সে ত্রিশ টাকার বিনিময়ে গুরুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ঈসা (আ.)-এর থলে দুই হাজার টাকায় পূর্ণ থাকত। এই ছিল তাদের অবস্থা। এর বিপরীতে রসূলে আকরম (সা.) এর অবস্থা এই ছিল যে মৃত্যুকালে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে বাড়িতে কি কিছু আছে? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তর দেন, এক দিনার অবশিষ্ট আছে। হুযুর (সা.) সেটি বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র রসূল খোদা তা'লার দিকে সফর করছে আর তার ঘরে এক দিনার রেখে যাচ্ছে, এও কি সম্ভব?

মুসলমানেরা এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে নি। যে সময় ইসলামের প্রয়োজন ছিল কঠোর বৌদ্ধিক জিহাদের, সেই সময় তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিরা মুসাল্লা পেতে এবং তসবীহ হাতে নিয়ে বাড়িতে বসে থেকেছে আর সেই কর্ম থেকে উদাসীন থেকেছে যা জাতিগত উন্নতির জন্য জরুরী ছিল।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউনুসের ৫ নং আয়াত لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ এর ব্যাখ্যায় বলেন:

" এই আয়াতে যে 'পুণ্যকর্ম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এতে ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনের উন্নতির এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে এর অনুবাদ করা হয় পুণ্যকর্ম, কিন্তু এর অর্থ পুণ্যকর্ম নয়, বরং পুণ্য এবং যথোপযুক্ত কর্ম। অর্থাৎ কর্ম প্রথমত পুণ্যের হবে এবং তা যেন সময়োপযুক্ত হয়। যেমন, জিহাদের জন্য বের হচ্ছে আর রোযাও রাখছে-এমন যেন না হয়। রোযা একটি পুণ্যকর্ম, কিন্তু জিহাদে যাওয়ার ক্ষেত্রে সময়োযুক্ত নয়। এই কারণে রসূল করীম (সা.) একটি জিহাদের সময় বলেছেন, আজ রোজাহীনরা রোজাদারদের থেকে এগিয়ে গেল। কেননা রোজাদাররা রোজার কষ্টের কারণে শিবিরের ব্যবস্থা করতে পারে নি আর রোজাহীনরা তৎক্ষণাৎ শিবির তৈরী করে ফেলেছে। বস্তুত, ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি সব ভালকাজের মাধ্যমে হয় না, বরং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

(শেষাংশ ২ এর পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

إِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

উত্তরে মহম্মদ হোসেন বাটালবী লেখেন- "কেবল হযরত ইবনে উমর এর ভাষ্যমতে ইবনে সিয়াদকে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বা মসীহি দাজ্জাল বলা হয়েছে। কেননা, জাবের এবং হযরত উমর এর বিবৃতি থেকে একথা স্পষ্ট নয় যে সেই ব্যক্তিই মসীহি দাজ্জাল, বরং ইবনে সিয়াদকে কেবল দাজ্জাল বলা হয়েছে, যার দ্বারা মোট ত্রিশটি দাজ্জালের একটিকে বোঝানো হতে পারে।"

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৪)

মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব আরও লেখেন: " হযরত উমর আঁ হযরত (সা.)-এর সমক্ষে ইবনে সিয়াদকে যে দাজ্জাল বলেছেন এবং এ নিয়ে কসম খেয়েছিলেন, এর মধ্যে এই ব্যাখ্যা নেই যে, ইবনে সিয়াদই সেই দাজ্জাল যার আগমণের লক্ষণ আঁ হযরত (সা.) বর্ণনা করে আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণ যার সম্পর্কে নিজেদের উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। কাজেই এবিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে যে হযরত উমরের এই বয়ানের অর্থ হতে পারে ইবনে সিয়াদ সেই ত্রিশজন দাজ্জালের একজন যার প্রাদুর্ভাবের সংবাদ আঁ হযরত (সা.) দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আঁ হযরত (সা.)-এর নীরবতা পালন আপনার কোনও কাজে আসবে না। কেননা এই নীরবতা ইবনে সিয়াদকে শেষ দাজ্জাল বলার বিষয়ে ছিল না, বরং সমস্ত দাজ্জালের মধ্য থেকে কোনও এক দাজ্জালের বিষয়ে ছিল।"

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৪)

এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লেখেন-

"'আদ্দাজ্জাল শব্দ সম্পর্কে যা কিছু আপনি বর্ণনা করেছেন তা সবই নিরর্থক। আপনি কি জানেন না যে প্রতিশ্রুত দাজ্জালের জন্য 'আদ্দাজ্জাল' একটি নাম নির্ধারিত হয়েছে? সহী বুখারী ১০৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আপনি যদি সহী বুখারীতে বর্ণিত 'আদ্দাজ্জাল'কে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য বলে প্রমাণ করে দেখাতে পারেন, তবে আমি আপনাকে নগদ পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব। অন্যথায় মৌলবী সাহেব অহেতুক হঠকারিতা থেকে বিরত হোন!

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○

হাদীস প্রণিধান করার কিঞ্চিত পরিমাণ যোগ্যতাও যদি আপানার থাকে, তবে সহী বুখারী কিম্বা সহী মুসলিমে প্রতিশ্রুত দাজ্জালের প্রেক্ষিত ছাড়াও 'আদ্দাজ্জাল' শব্দের ব্যবহার অন্য কোথাও হয়েছে তা প্রমাণ করুন। অন্যথায় আপনার কথা মতেই এমন কথা বলা সেই ব্যক্তির কাজ যে হাদীস তো দূরের কথা কোনও মানুষের কথা বোঝারও ক্ষমতা রাখে না। এটি আপনারই মুখ নিঃসৃত বাক্য, আপনি রুষ্ট হবেন না।"

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২১)

যেমনটি আমি বর্ণনা করেছিলাম যে, সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই চ্যালেঞ্জটিকে তাঁর রচনা ইযালায়ে আওহাম গ্রন্থেও মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর জন্য উপস্থাপন করেছেন। ইযালায়ে আওহাম পুস্তকে তাঁর এই শৌর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ তাঁর নিজের ভাষাতেই দেওয়া হল। তিনি মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীকে সম্বোধন করে বলেন:

"আপনি বলেছিলেন, 'আদ্দাজ্জাল' বলতে বিশেষ করে মসীহী দাজ্জালকে বোঝানো হয় নি। বরং অন্যান দাজ্জালদের জন্য সহী হাদীসসমূহে 'আদ্দাজ্জাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আপনাকে যখন বলা হল যে এটি আপনার ভুল। রসুল করীম (সা.)-এর হাদীস এর প্রকৃত জ্ঞান আপনার ভাগ্যে নেই। যদি আপনি সিহাহ সিত্তায় প্রতিশ্রুত দাজ্জালের প্রেক্ষিত ছাড়াও 'আদ্দাজ্জাল' শব্দের ব্যবহার অন্য কোথাও হয়েছে তা প্রমাণ করে দেন, তবে আমি আপনি পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব। কিন্তু আপনি এমনই নীরবতা পালন করলেন যে, কোনও উত্তরই দিতে পারলেন না।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭৪)

এরপর পাঁচ টাকার পুরস্কারকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে তিনি পঞ্চাশ টাকা করে দেন। তিনি বলেন: 'আদ্দাজ্জাল' বলতে বিশেষ করে প্রতিশ্রুত দাজ্জালকে বোঝানো হয় নি বলে আপনি যে অজুহাত পেশ করেছেন, তা আপনার মন্দবুদ্ধি ও স্বল্পজ্ঞানী হওয়ার বিষয়ে পরম সাক্ষ্য। হযরত মৌলবী সাহেব! যদি আপনি সহী বুখারী কিম্বা সহী মুসলিমে প্রতিশ্রুত দাজ্জালের প্রেক্ষিত ছাড়াও 'আদ্দাজ্জাল' শব্দের ব্যবহার অন্য কোনও সাহাবার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছে, কোথাও হয়েছে তা প্রমাণ করে দেন, তবে আমি আপনাকে পাঁচ টাকার পরিবর্তে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দিব। আপনি কেন নিজের অজ্ঞতা এভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করছেন!নীরব থাকুন, সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৭৭)

এরপর পুরস্কার রাশি পঞ্চাশ থেকে বাড়িয়ে তিনি এক হাজার টাকা করে দেন। তিনি বলেন-

" অনুরূপভাবে মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব বা তাঁর কোন সমচিন্তক যদি প্রমাণ করে দেন যে, 'আদ্দাজ্জাল' শব্দ যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তা প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ভিন্ন অন্য কোনও দাজ্জালের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে, তবে সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে, আমি এমন ব্যক্তিকেও যেভাবে হোক হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দিব। চাইলে আমার কাছে রেজিস্টি করিয়ে নিন কিম্বা লিখিয়ে নিন।"

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬০৩)

মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের দুর্ভাগ্য! শয়তান তাকে তাকে নবীর বিরোধীতা করতে প্ররোচিত করে। এখানে আমি সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই আরবী পঙক্তির অনুবাদ উপস্থাপন করছি যা স্থায়ীভাবে শিরোনামে রাখা আছে। 'যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সেগুলির মধ্যে নিকৃষ্টতম বস্তু হল বিষ আর বিষের মধ্যে নিকৃষ্টতম হল পুণ্যবানদের শত্রুতা।' হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর বিরোধীতার পর মহম্মদ হোসেন বাটালবীর সকল সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয় আর সারা জীবন লাঞ্ছনা ছাড়া তাঁর আর কিছুই অর্জিত হয় নি।

মহম্মদ হোসেন বাটালবীকে ২৫টাকা পুরস্কারের ঘোষণা।

১৮৯১ সালের ২০ থেকে ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর মাঝে বারো দিন ব্যাপি মুবাহাসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মোবাহাসার বিষয় বস্তু ছিল 'ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু।' কিন্তু মহম্মদ হোসেন বাটালবী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আসল বিষয়ের দিকে পা বাড়ায় নি। তিনি জানতেন যে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে তিনি যুক্তি দাঁড় করাতে পারবেন না। কেননা, এই বিতর্কে কুরআন মজীদের আয়াতের সামনে তাঁর এক মিনিট টিকে থাকাও দুষ্কর। তিনি পুরো তর্কযুদ্ধটিকে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের মকাম ও মর্যাদায় আটকে রাখেন। যেমন, ২ নং পত্রে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে জানতে চান যে, রেওয়ায়েতের নিয়ম অনুসারে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসসমূহ শর্তহীনভাবে এবং বিনা কালক্ষেপে আমলযোগ্য কি না? কিম্বা এই দুই হাদীস গ্রন্থে এমন হাদীসও কি আছে যেগুলি আমল করা এবং বিশ্বাস করা বৈধ নয়?

এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"কিতাব ও সুন্নতের অকাট্য শরীয় বিধান হওয়ার বিষয়ে আমার বিশ্বাস, কিতাবুল্লাহ্ সর্বাগ্রে, সকলের উর্দ্ধে। আমরা যদি এমন কোনও হাদীস পাই যা কুরআন করীমের বর্ণনার পরিপন্থী হয়, আর কোনওভাবেই আমরা তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম না হই, এমন হাদীসকে আমরা 'মৌজু' বা বাতিলযোগ্য আখ্যা দিব। কেননা মহা সম্মানিত আল্লাহ্ তা'লা বলেন 'ফাবিআইয়ু হাদীসিন বাআদাল্লাহি ওয়া আয়াতিহি ইউমেনুন। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর আয়াত সমূহের পর কোন কথার উপর ঈমান আনবে?

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমার মোটেই এমন বিশ্বাস নেই যে, বর্ণনার দৃষ্টিকোণ থেকেও হাদীসকে সন্দেহাতীতভাবে সেই মর্যাদা দিব, যেমনটি কুরআন করীমের মর্যাদার উপর বিশ্বাস রাখি। হাদীসগুলির মধ্যেই স্ববিরোধ স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, সেগুলি বিকৃতি থেকে মুক্ত নয়। তবে কিভাবে একজন মোমেন বিশ্বাস করতে পারে যে হাদীসগুলি বর্ণনাগত প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন করীমের প্রমাণের সমকক্ষ হতে পারে! আপনি কিম্বা অন্য কোনও মৌলবী সাহেব কি এমন মত ব্যক্ত করতে পারেন যে, কুরআন করীম প্রমাণের দিক থেকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সেই একই মর্যাদায় হাদীসও রয়েছে? কাজেই আপনি যখন নিজেই বিশ্বাস করেন যে হাদীসসমূহ বর্ণনাগত প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রমাণের থেকে নীচে অবস্থান করে ... সেক্ষেত্রে আপনি কেন এবিষয়ের উপর কেন জোর দিচ্ছেন যে সেই সম পরিমাণ মর্যাদায় সেগুলিকে বিশ্বাস করে নেওয়া উচিত, যে মর্যাদায় কুরআন করীমকে মান্য করা হয়?

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪-১৫)

জুমআর খুতবা

হযরত আলী হযরত যুবায়ের (রা.) কে বললেন, আপনি আমার সাথে যুদ্ধের জন্য তো সেনাদল প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু খোদার সমীপে উপস্থাপন করার জন্য কোনও অজুহাতও কি প্রস্তুত রেখেছেন? আপনারা কেন নিজ হাতে সেই ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত যার সেবা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে করেছিলেন?

তরবিয়তের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো, আপনি স্বয়ং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক অধ্যায়নের পাশাপাশি এমটিএ'র সাথেও সম্পর্ক রাখুন আর বিশেষভাবে জুমুআর খুতবা অবশ্যই এমটিএ'র মাধ্যমে শুনুন। যেন খেলাফতের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে, দৃঢ়তর হয় বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান বদরী সাহাবা আবু তুরাব খলীফায়ে রাশেদা আঁ হযরত (সা.)-এর জামাতা হযরত আলি বিন আবি তালিব পবিত্র জীবনালেখ্য।

পাকিস্তানী আহমদী, পাকিস্তানে অবস্থানরত আহমদীরা বিশেষভাবে বেশি বেশি নফল আদায় ও দোয়ার প্রতি জোর দিন।

এসব দোয়ার মাঝে রয়েছে, رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ - এই দোয়া অধিকহারে পাঠ করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ দোয়াটিও অনেক বেশি পাঠ করুন। ইস্তেগফার করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। দরূদ শরীফ পাঠের প্রতিও মনোযোগী হোন; আজকাল এর প্রয়োজন অনেক বেশি। আমি যেমনটি বলেছি, নফল ইত্যাদিও পড়ুন। আল্লাহ্ তাদের তৌফিক দিন আর দ্রুত সেখানকার অবস্থাও অনুকূল করুন।

আলজেরিয়া এবং পাকিস্তানে আহমদীদের প্রবল বিরোধীতার কথা দৃষ্টিপটে রেখে বিশেষ দোয়ার প্রতি আহ্বান।

পাঁচজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব, যারা হলেন, মাননীয় আব্বাস বিন আব্দুল কাদির সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া হুমদা আব্বাস সাহেবা (সিন্ধ), মাননীয় রিযওয়ান সৈয়্যদ নাইমী সাহেব (ইরাক), মাননীয় মালিক আলি মহম্মদ সাহেব (সারগোধা), মাননীয় আহসান আহমদ সাহেব (লাহোর) এবং মাননীয় রিয়াজুদ্দীন শামস সাহেব।

আলজেরিয়ায় আদালতে দুইজন আহমদী মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুক্ত।

পাকিস্তানের আহমদীদের নফল ও দোয়ার প্রতি আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৫ ডিসেম্বর, ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২৫ ফাতাহ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:গত খুতবায় হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত এবং বিদ্রোহীদের বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে হযরত আলীর চেষ্টা-প্রচেষ্টা কিংবা (আলোচনার ধারাবাহিকতায়) এরপর হযরত আলী (রা.)'র যেসব ঘটনা আসবে, এ সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন,

"যেহেতু তোমরাও সাহাবীদের সাথে সামঞ্জস্য রাখ তাই আমি ইতিহাস থেকে বর্ণনা করতে চাই যে কীভাবে মুসলমানরা ধ্বংস হয়েছে আর তাদের ধ্বংসের কারণগুলো কী-কী। অতএব তোমরা সাবধান হয়ে যাও আর তোমাদের নবাগতদের জন্য তালীম বা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করো। অর্থাৎ সঠিক তরবিয়ত হওয়া চাই, তাদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া চাই। হযরত উসমান (রা.)-এর সময় যে নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছিল, তা সাহাবীদের পক্ষ থেকে উদ্ভূত নয়। যারা বলে যে, সাহাবারা এই নৈরাজ্যের হোতা ছিলেন, তারা মূলত ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধীতায় অনেক সাহাবী দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, মুয়াবীয়া (রা.)-এর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল কিন্তু আমি বলছি যে, এই নৈরাজ্যের হোতা সাহাবীরা ছিলেন না, বরং তারাই ছিল যারা পরবর্তীতে এসেছে আর মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য পায় নি এবং যাদের তাঁর সাহচর্যে বসারও সুযোগ হয় নি। অতএব আমি আপনাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি আর নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকার যে পদ্ধতি বলছি তা হল, অধিকহারে কাদিয়ান আসুন (তখন তিনি কাদিয়ানে ছিলেন) এবং বারবার আসুন, যেন আপনাদের ঈমান সতেজ থাকে এবং আপনাদের আল্লাহ্ভীতি যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

(আনোয়ারে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭১)

অর্থাৎ আপনাদের কেন্দ্রের সাথেও সম্পর্ক থাকতে হবে এবং খেলাফতের সাথেও সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। এগুলো থাকলে তরবিয়ত বা শিক্ষাদীক্ষার মানও সঠিক থাকবে।" বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ'র কল্যাণে ধন্য করেছেন। খুতবা সমগ্র পৃথিবীতে শোনা যায় দেখানো হয়, শোনানো হয় এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা দেখানো হয় আর শোনানোও হয়। তাই তরবিয়তের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো, আপনি স্বয়ং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক অধ্যায়নের পাশাপাশি এমটিএ'র সাথেও সম্পর্ক রাখুন আর বিশেষভাবে জুমুআর খুতবা অবশ্যই এমটিএ'র মাধ্যমে শুনুন। যেন খেলাফতের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে, দৃঢ়তর হয় বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উষ্ট্রীর যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে রেওয়ায়েতে এসেছে যে, উষ্ট্রীর যুদ্ধ হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আয়েশা(রা.)'র মাঝে ৩৬ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.)'র সাথে হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরও ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) উক্ত যুদ্ধের ময়দানে একটি উটে আরোহিত ছিলেন তাই সেই যুদ্ধের নাম উষ্ট্রীর যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধ। হযরত আয়েশা (রা.) হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে অবস্থান কালেই হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পান। উমরা আদায় শেষে তিনি যখন মদীনার দিকে যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে সারফ্ নামক জায়গায় উবায়েদ বিন আবু সালামা সংবাদ দেন যে, হযরত উসমান (রা.)কে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে এবং হযরত আলী (রা.) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। মদীনা মুনাওয়ারায় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজমান। অতএব হযরত আয়েশা (রা.) সেখান থেকেই মক্কায় ফেরত যান এবং হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং নৈরাজ্যের অবসান কল্পে লোকদের সমবেত করেন। হযরত আয়েশা, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর নেতৃত্বে অনেকেই সমবেত হয় আর এই কাফেলা সেখান থেকে বসরা অভিমুখে যাত্রা করে। হযরত আলী (রা.)ও বসরার দিকে যাত্রা করেন এটি দেখে যে, কাফেলা সেদিকেই যাচ্ছে। বসরা পৌঁছে হযরত আয়েশা (রা.) নগরবাসীকে তার দলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রন জানান। নগরবাসীর একটি বড় সংখ্যা হযরত আয়েশা

(রা.)'র দলে যোগ দেয় কিন্তু একটি জামা'ত হযরত আলী (রা.)'র নিযুক্ত বসরার গভর্ণর উসমান বিন হুনায়ফ এর হাতে বয়আত করে। উভয় জামাতের মাঝে তখন হাতাহাতি হয়। হযরত আলীর বাহিনীও সেখানে পৌঁছে যায় এবং হযরত আলী (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)'র ঘাটির পাশেই তাবু স্থাপন করেন। উভয় পক্ষ থেকে মীমাংসার চেষ্টা হয় আর আলোচনা আরম্ভ হয় কিন্তু রাতের বেলা সেই দল যারা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যায় জড়িত ছিল তাদের একটি অংশ হযরত আলী (রা.)'র বাহিনীতেও ছিল, তারা হযরত আয়েশা (রা.)'র বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বসে যার ফলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) উটে আরোহিত ছিলেন। বীর যোদ্ধারা একে একে উটের লাগাম ধরে শহীদ হতে থাকে। হযরত আলী (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) যতক্ষন উটে আরোহিত থাকবেন ততক্ষণ যুদ্ধ শেষ হবে না। তাই তিনি যোদ্ধাদের নির্দেশ দেন এই উটকে কোন না কোনভাবে ধরাশায়ী কর, কেননা এটিকে ধরাশায়ী করলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে। তখন এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে উটের পায়ে তরবারির আঘাত হানে ফলে সেই উট মাটিতে ছটফট করতে করতে বসে পড়ে। হযরত আলীর বাহিনী উক্ত উটকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। হযরত আয়েশা (রা.)'র উট পড়ে যাওয়ার পর তাঁর যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারপর হযরত আলী (রা.) ঘোষণা দেন, যারা অস্ত্র সমর্পন করবে এবং যারা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তারা নিরাপদ থাকবে। (নিজ সৈন্যদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন) কারো যেন পিছুধাওয়া করা না হয়, কারো সম্পদকে গনিমতের মাল মনে করে তা যেন হস্তগত করা না হয়। হযরত আলীর সৈন্যবাহিনী সেই নির্দেশ পালন করে। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

(আল কামিলু ফিততারিখ আয ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৯-১৪৯)

এই অংশটা ইবনে আসিরের ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, যারা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার সাথে জড়িত ছিল তাদের একটি দল হযরত আয়েশা (রা.)কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার নামে জেহাদের ঘোষণা দিতে সম্মত করে। তদনুসারে তিনি এই যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং সাহাবীদেরকে নিজ সাহায্যার্থে আহবান জানান। হযরত তাল্হা এবং হযরত যুবায়েরও তার সাথে যোগ দেন আর এর ফলে হযরত আয়েশা, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের বাহিনীর সাথে হযরত আলীর সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অর্থাৎ হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের হযরত আয়েশা (রা.)-এর সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। এভাবে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-বাহিনীর মাঝে সংঘটিত এ যুদ্ধকে 'জঙ্গে জামাল' (অর্থাৎ উষ্ট্রীর যুদ্ধ)বলা হয়, সেই যুদ্ধের শুরুতেই হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আলী (রা.)-র মুখে নবী করীম (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে পৃথক হয়ে গেলেন এবং তিনি শপথ করলেন যে, তিনি হযরত আলীর সাথে যুদ্ধ করবেন না আর এই কথা স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যাখ্যায় ভুল করেছেন। অপরদিকে হযরত তালহা (রা.)ও তার মৃত্যুর পূর্বে হযরত আলী (রা.)'র হাতে বয়াতের অঙ্গীকার করেন। ইতিপূর্বে গত খুতবায় এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা রেওয়ায়াতসমূহে এসেছে যে, তিনি আহত অবস্থায় প্রবল যন্ত্রনায় ছটফট করছিলেন, সে সময় এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন দলের সাথে সম্পর্ক রাখ? সেই ব্যক্তি বললো, হযরত আলীর দলের সাথে। তখন তিনি নিজ হাত তার হাতে রেখে বললেন যে, 'তোমার হাত আলীর হাত, আর আমি তোমার হাতে হাত রেখে পুনরায় হযরত আলীর বয়াত করছি। মোটকথা জামালের যুদ্ধের সময়েই অবশিষ্ট সাহাবীদের মতবিরোধের সমাধান হয়ে যায় কিন্তু হযরত মুয়াবিয়ার মতবিরোধ সিফ্ফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত চলতে থাকে।"

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪৮৫-৪৮৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আরো বলেন,

হযরত উসমানের হত্যাকারী দল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নিজেদেরকে অভিযোগমুক্ত করার জন্য অন্যদের ওপর অপবাদ আরোপ করছিল। যখন তারা বুঝতে পারল, হযরত আলী মুসলমানদের বয়আত নিয়েছেন তখন তারা তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপের উৎকৃষ্ট সুযোগ পেয়ে গেল। যদিও প্রকৃত ঘটনা এমনই ছিল অর্থাৎ হযরত উসমানের হত্যাকারীদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি তাঁর (হযরত আলীর) চতুর্পার্শ্বে সমবেত হয়ে গিয়েছিল তাই অপবাদ আরোপের উত্তম সুযোগ তাদের হাতে এসে গেল। যেমন তাদের মধ্য থেকে যে দলটি মক্কার দিকে গিয়েছিল তারা হযরত আয়েশাকে এ বিষয়ে সম্মত করে যে তিনি যেন হযরত উসমানের হত্যার প্রতিশোধের জন্য জেহাদের ঘোষণা দেন। সুতরাং তিনি এ কথার ঘোষণা দেন এবং সাহাবাদেরকে নিজেদের সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানালেন। হযরত তালহা ও যুবায়ের হযরত আলীর বয়আত এ শর্তে করেছিলেন যে, যতশীঘ্র সম্ভব তিনি হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নিবেন। তারা শীঘ্র প্রতিশোধের যে অর্থ বুঝতেন তা হযরত আলীর দৃষ্টিতে স্থানকাল অনুপযোগী ছিল। হযরত আলীর ধারণা ছিল, সকল প্রদেশে শান্তিশৃখলা বহাল হওয়ার পর হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাবে। কেননা ইসলামের সুরক্ষা সবকিছুর ওপর অগ্রগণ্য, হত্যাকারীদের (শাস্তির) বিষয়টি বিলম্বিত হলেও কোন সমস্যা নেই। অনুরুপভাবে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মতানৈক্য ছিল। যেসব লোক নিতান্ত বিমর্ষ চেহারা নিয়ে হযরত আলীর কাছে পৌছে গিয়েছিল এবং ইসলামে দলাদলির আশঙ্কা প্রকাশ করছিল তাদের ব্যাপারে হযরত আলী স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ করতে পারেন নি যে, এসব লোকই বিশৃংখলার হোতা। অন্যরা এদের সন্দেহ করতো অর্থাৎ হযরত আলীর তাদের প্রতি কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু অন্যরা তাদের সন্দেহ করত। এ মতপার্থক্যের কারণে তালহা ও যুবায়ের মনে করলেন, হযরত আলী তার অঙ্গীকার থেকে সরে যাচ্ছেন। কেননা তারা এক শর্তে বয়আত নিয়েছিলেন এবং তাদের মতে সেই শর্ত হযরত আলী পূর্ণ করেননি, এ কারণে তারা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদেরকে বয়আত থেকে মুক্ত মনে করতেন। যখন হযরত আয়েশার ঘোষণা তাদের কাছে পৌঁছল তখন তারাও তাদের সাথে মিলিত হলেন এবং সবাই মিলে বসরার দিকে চলে গেলেন। কিন্তু বসরার গভর্নর লোকদেরকে তাদের সাথে মিলিত হওয়া থেকে বিরত রাখে, কিন্তু যখন মানুষ জানতে পারল যে, তালহা এবং যুবায়ের কেবলমাত্র বাধ্য হয়ে এবং একটি শর্ত দিয়ে হযরত আলীর হাতে বয়আত করেছেন, তখন অধিকাংশ লোক তাদের সাথে মিলিত হল। যখন হযরত আলী সেই বাহিনীর সংবাদ পেলেন, তখন তিনিও একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং বসরার দিকে রওনা হলেন। বসরা পৌছে তিনি এক ব্যক্তিকে হযরত আয়েশা, তালহা ও যুবায়েরের কাছে প্রেরণ করলেন। সেই ব্যক্তি প্রথমে হযরত আয়েশার সমীপে উপস্থিত হল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনার অভিপ্রায় কী? তিনি জবাব দিলেন, আমাদের অভিপ্রায় কেবল মাত্র পরিশুদ্ধ করা। এরপর সেই ব্যক্তি তালহা ও যুবায়েরকে ডাকল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনারাও একই কারণে যুদ্ধের জন্য রাজি হয়েছেন? তারা বললেন, হ্যাঁ অর্থাৎ, সংশোধনের উদ্দেশ্যে। সেই ব্যক্তি জবাব দিল, যদি আপনাদের ইচ্ছা এটি হয় তাহলে এর পদ্ধতি এটি নয় যা আপনারা অবলম্বন করেছেন। এর পরিণাম তো বিশৃংখলা। এ সময় দেশের অবস্থা এমন যে, যদি এক ব্যক্তিকে আপনারা হত্যা করেন তবে হাজার হাজার লোক তার সমর্থনে দণ্ডায়মান হবে এবং তাদের মোকাবিলা করবে, আরো বহু লোক তাদের সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হবে। অতএব এই ধারা চলতেই থাকবে। তাই সমাধান হল, প্রথমে দেশকে ঐক্যের রজ্জুতে বাঁধা হোক, এরপর দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দিলে চলবে। নতুবা এমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে কাউকে শাস্তি দেওয়া দেশে আরো অধিক অরাজকতা সৃষ্টির নামান্তর। শাসন ব্যবস্থা আগে দৃঢ় হোক তখন তারা শাস্তি দিবে। এটি শুনে তারা বলে, যদি হযরত আলীর মতামতও এটিই হয় তাহলে তিনি যেন আসেন। আমরা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত আছি। তখন সেই ব্যক্তি হযরত আলীকে এটি অবগত করল এবং দুই দলের প্রতিনিধিরা একজন আরেকজনের সাথে সাক্ষাত করে সিদ্ধান্ত নিলেন, যুদ্ধ করা ঠিক হবে না সন্ধি হওয়া উচিত। এ সংবাদ যখন আব্দুল্লাহ বিন সাবার লোকদের নিকট তথা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী সাবাঈদের নিকট পৌঁছল তখন তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং গোপনে তাদের এক দল শলা পরামর্শের জন্য সমবেত হয়। তারা পরামর্শ শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, মুসলমানদের মাঝে সন্ধি হওয়া আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে কেননা, মুসলমানরা যতক্ষণ পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত থাকবে ততক্ষণ আমরা হযরত উসমানের হত্যার শাস্তি এড়াতে পারবো। যদি সন্ধি হয়ে যায় আর শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তাহলে আমাদের কোন ঠাঁই থাকবে না কোথাও মাথা গোঁজার ঠাই পাব না। এজন্য যেভাবেই হোক না কেন সন্ধি হতে দেয়া যাবে না। ইতিমধ্যে হযরত আলী (রা.) -ও এসে পৌঁছেন আর তাঁর পৌঁছার পরদিন সেখানে তাঁর ও হযরত যুবায়েরের সাক্ষাত হয়। সাক্ষাৎকালে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার সাথে যুদ্ধের জন্য তো আপনি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছেন কিন্তু খোদার দরবারে উপস্থাপনের জন্য কোন ওজর বা অজুহাতও কি প্রস্তুত করেছেন? আপনারা কেন নিজ হাতে সেই ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত যার সেবা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে করেছিলেন? আমি কি আপনাদের ভাই নই? তাহলে এখন কী হলো!

প্রথমে পরস্পরকে হত্যা করা হারাম জ্ঞান করা হতো কিন্তু এখন তা হালাল হয়ে গেল! নতুন কোন বিষয়ের সূচনা হলে তবুও কথা ছিল কিন্তু যখন নতুন কোন বিষয় সৃষ্টিই হয় নি তাহলে কেন এই যুদ্ধ? এতে হযরত তালহা (রা.) যিনি হযরত যুবায়েরের সাথে ছিলেন তিনি বলেন আপনি হযরত উসমানকে হত্যার জন্য মানুষকে প্ররোচিত করেছেন। হযরত আলী বলেন, আমি হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের অভিসম্পাত করি। এরপর হযরত আলী (রা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে বলেন, তোমার কি মনে নেই, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আল্লাহর কসম তুমি আলীর সাথে যুদ্ধ করবে আর তুমি যালেম বা অন্যায়ের ওপর থাকবে। অর্থাৎ হযরত যুবায়ের (রা.)-কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন। একথা শুনে হযরত যুবায়ের নিজ সৈন্যবাহিনীর দিকে ফিরে যান এবং কসম খান যে, তিনি হযরত আলীর সাথে কোনক্রমেই যুদ্ধ করবেন না আর স্বীকার করেন যে, তিনি বুঝতে ভুল করেছিলেন। এ সংবাদ যখন সৈন্যবাহিনীর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তখন সবাই আশ্বস্ত হয় যে, এখন আর যুদ্ধ হবে না, সন্ধি বা মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা কঠিন দুশ্চিন্তায় পড়ে। যাদের অভিপ্রায় ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টির, স্বাভাবিক ভাবেই তারা আতঙ্কিত হওয়ার ছিল আর তাই তারা ভয় পেতে থাকে। রাত নেমে আসলে তারা সন্ধিকে নস্যাৎ করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছে তা হলো, তাদের মধ্য থেকে যারা হযরত আলীর সাথে ছিল তারা হযরত আয়েশা, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরের সৈন্যবাহিনীতে হামলা করে দেয় পক্ষান্তরে তাদের সৈন্যবাহিনীতে যারা ছিল তারা হযরত আলীর সৈন্যবাহিনীতে রাতের বেলা আক্রমণ করে বসে। মুনাফিকরা উভয় দলে অর্থাৎ হযরত আয়েশার ও হযরত আলীর দলেও বিভক্ত হয়ে অর্ন্তভুক্ত হয়ে ছিল। উভয়ে একে অপরের উপর হামলা করে বসে অর্থাৎ বিরোধী দলের উপর আক্রমণ করেছে নিজেদের মাঝে যুদ্ধ করে নি। এরফলে, চারিদিকে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় আর প্রত্যেক দলই মনে করে, অপর পক্ষ ধোকা দিয়েছে অথচ এটি কেবল সাবাঈদের একটি ষড়যন্ত্র ছিল। যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে যায় তখন হযরত আলী (রা.) চিৎকার করে বলেন যে, কেউ গিয়ে হয়রত আয়েশাকে সংবাদ দিক, হতে পারে তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবেন। অতঃপর হযরত আয়েশার উট সম্মুখে নিয়ে আসা হয় কিন্তু পরিণাম আরো ভয়াবহ হয়। নৈরাজ্যবাদীরা যখন দেখল যে, তাদের ষড়যন্ত্রের ফলাফল উল্টো প্রকাশ পাচ্ছে তখন তারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর উটকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে। হযরত আয়েশা (রা.) উচ্চস্বরে লোকদেরকে আহ্বান করে বলা আরম্ভ করলেন যে, হে লোকসকল যুদ্ধ পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ ও বিচারদিবসকে স্মরণ কর। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা বিরত হল না বরং অব্যহতভাবে তাঁর উট লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করতে থাকে। যেহেতু বসরাবাসীরাও হযরত আয়েশা (রা.) -এর চতুর্পাশ্বে সমবেত সৈন্যবাহিনীর সাথে ছিল তারা এটি দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর উম্মুল মোমেনীনের এ অবমাননা দেখে তাদের ক্রোধের আর সীমা রইল না, তারা তরবারি বের করে বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীর ওপর হামলে পড়ে ফলে তখন হযরত আয়েশার উটই যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সাহাবাগণ এবং বড় বড় বীর তার চারপাশে সমবেত হয়ে যায়; একের পর এক তারা নিহত হতে থাকেন কিন্তু তারা উটের লাগাম ছাড়েনি। হযরত যুবায়ের যুদ্ধে অংশই নেন নি এবং কোন এক দিকে বেরিয়ে যান। একজন হতভাগা তাঁর নামাযরত অবস্থায় পেছন দিক থেকে এসে তাকে শহীদ করে। হযরত তালহা একান্ত যুদ্ধের ময়দানেই এসব দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হন। যুদ্ধ যখন তুমুল রূপ ধারণ করে; এটি অনুভব করে যে হযরত আয়েশা (রা.) কে যতক্ষন পর্যন্ত না যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরানো হবে ততক্ষন এই যুদ্ধ শেষ হবে না- কিছু মানুষ তাঁর উটের পা কেটে দেয় এবং হাওদা নামিয়ে মাটিতে রেখে দেয়; তখন যুদ্ধ শেষ হয়। এ ঘটনা দেখে হযরত আলী (রা.)-এর চেহারা দুঃখের আতিশয্যে রক্তিমবর্ণ ধারণ করে, তবে যা-ই ঘটেছে তা এড়ানোরও কোন কোন উপায় ছিল না। যুদ্ধ শেষে যখন মৃতদের মাঝে হযরত তালহার মৃতদেহ উদ্ধার হলো হযরত আলী (রা.) গভীর অনুশোচনা ব্যাক্ত করেন। এই সমস্ত ঘটনাবলী থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত যে, এই যুদ্ধে সাহাবীদের কোন প্রকার ভূমিকা ছিল না বরং এই অপকর্ম হযরত উসমান (রা.)-এর ঘাতকদের দ্বারাই রচিত হয়েছিল। সত্য কথা হলো তালহা এবং যুবায়ের হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বয়াত করেই মারা গিয়েছেন কেননা তারা নিজের ইচ্ছা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং হযরত আলীর সঙ্গ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু কতিপয় কুচক্রীদের হাতে নিহত হয়েছেন। এরপর হযরত আলী (রা.) তাদের হত্যাকারীদের প্রতি অভিসম্পাতও করেছেন।

(আনোয়ারে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৮-২০১)

উষ্ট্রীর যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্য সমস্ত বাহন এবং পাথেয় প্রস্তুত করেন এবং হযরত আয়েশাকে বিদায় দেওয়ার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হন। হযরত আয়েশার সফরসঙ্গী হিসেবে যাদের যাওয়ার ছিল তাদের রওনা করান। এমনকি হযরত আয়েশা (রা.)-এর যাত্রার দিন হযরত আলী (রা.) স্বয়ং হযরত আয়েশার কাছে যান এবং তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। হযরত আয়েশা (রা.) সবার উপস্থিতিতে মানুষের সামনে বের হন এবং বলেন, হে আমার সন্তানেরা! আমরা পরস্পরকে কষ্ট দিয়ে এবং বাড়াবাড়ি করে একে অপরকে অসন্তুষ্ট করেছি। ভবিষ্যতে আমাদের এসব মতবিরোধের কারণে কেউ কারো প্রতি যেন অন্যায়-অবিচার না করে। খোদা তা'লার কসম! আমার এবং হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে শুরু থেকেই কোন ধরনের মতবিরোধ ছিল না; তবে পুরুষ ও তার শশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সচরাচর ছোটখাট যেসব বিষয় ঘটে থাকে সেগুলো ব্যতীত। আর হযরত আলী (রা.) আমার পুণ্য অর্জনের মাধ্যমস্বরূপ। হযরত আলী (রা.) বলেন, হে লোকসকল! হযরত আয়েশা (রা.) উত্তম ও সত্য কথা বলেছেন। আমার ও হযরত আয়েশার মাঝে কেবল এতটুকুই বিরোধ ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) ইহ ও পরকালে তোমাদের সম্মানিত নবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী। হযরত আলী (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে বেশ কয়েক মাইল তাঁর সাথে যান এবং হযরত আলী (রা.) তাঁর পু ত্রদের আদেশ দেন, তারা যেন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে যান এবং একদিন পর ফিরে আসেন। উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি তাবরী থেকে নেওয়া।

(তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬০-৬১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে,

হযরত তালহা মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরও জীবিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মাঝে যখন মতবিরোধ দেখা দেয় এবং এক দল বলে যে, আমাদের উচিত হযরত উসমান (রা.)-এর ঘাতকদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। সেই দলের নেতা ছিলেন হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের ও হযরত আয়েশা (রা.)। অপরদিকে অন্য দল বলে- মুসলমানদের মাঝে ভেদাভেদ অনেক বেড়ে গেছে, মানুষ তো মারা গিয়েই থাকে তাই আমাদেরকে এক্ষুনি সকল মুসলমানদের সমবেত করা উচিত যেন ইসলামের প্রতাপ ও মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পরবর্তীতে এদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব; এই দলের নেতা ছিলেন হযরত আলী (রা.)। এই বিরোধ এতটাই বৃদ্ধি পেল যে, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আয়েশা (রা.) এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে- হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে যারা শহীদ করেছে তাদের আশ্রয় দিতে চায়। অপরদিকে হযরত আলী (রা.) এই অভিযোগ করেন যে- যারা বলে, তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ নেওয়া উচিত; এদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থই মুখ্য, ইসলামের স্বার্থ নয়। বস্তুত মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল; আর এরপর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধও আরম্ভ হয়ে যায়, এমন যুদ্ধ যেখানে হযরত আয়েশা সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি উটে চড়ে নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তখন একজন সাহাবী হযরত তালহার কাছে আসেন এবং তাকে বলেন, তালহা, তোমার মনে আছে, অমুক দিন তুমি ও আমি রসূলে করীম (সা.)-এর সভায় বসে ছিলাম; রসূলে করীম (সা.) তখন বলেছিলেন, তালহা, এমন এক সময় আসবে যে তুমি এক সৈন্যদলে থাকবে আর আলী অপর সৈন্যদলে থাকবে, আর আলী সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর তুমি ভ্রান্তিতে থাকবে। একথা শুনে হযরত তালহার চোখ খুলে যায়; তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার একথা মনে পড়েছে! তিনি তখনই বাহিনী থেকে বের হয়ে চলে যান। তিনি যখন রসূলে করীম (সা.)-এর কথা শুনে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন এক হতভাগা যে হযরত আলীর বাহিনীর একজন সৈন্য ছিল, সে পেছন থেকে গিয়ে খঞ্জরাঘাতে তাকে শহীদ করে দেয়। হযরত আলী নিজের স্থানে বসে ছিলেন; হযরত তালহার হত্যাকারী এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে 'আমি অনেক বড় পুরস্কার পাব, দৌড়ে গিয়ে তাকে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনাকে আপনার শত্রুর নিহত হওয়ার সুসংবাদ

ইমাম মাহদীর বাণী

স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৮)

দোয়াপ্রার্থী : Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)

দিচ্ছি! হযরত আলী জিজ্ঞেস করেন, কোন শত্রু? সে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি তালহাকে হত্যা করেছি! হযরত আলী বলেন, হে হতভাগা আমিও তোমাকে রসূলে করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে তুমি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে! কারণ একবার যখন আমি ও তালহা বসে ছিলাম, তখন রসূলে করীম (সা.) বলেছিলেন, হে তালহা, তুমি একবার সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে অপমান বরণ করবে। তোমাকে এক ব্যক্তি হত্যা করবে, কিন্তু খোদা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"

(আনোয়ারুল উলুম, ২১তম খণ্ড, পৃ: ১৪৯-১৫০)

সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এর বৃত্তান্তে লেখা হয়েছে যে, এই যুদ্ধ হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে ৩৭ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। সিফফীন সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি স্থান। হযরত আলী কুফা থেকে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। সিফফীন পৌঁছে দেখতে পান, সিরিয়ান বাহিনী আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে আগেই সেখানে শিবির স্থাপন করে রেখেছে এবং তাদের একটি দল ফুরাত নদীর ঘাট দখল করে রেখেছিল। হযরত আলী আশ্বস্ত করেন যে 'আমরা লড়তে আসি নি, বরং আমীর মুয়াবিয়ার সাথে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে এসেছি; কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হন নি। সিরিয়ান বাহিনী হযরত আলীর বাহিনীকে ফুরাত নদী থেকে পানি নিতে বাধা দেয়, এতে হযরত আলী নিজ বাহিনীকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। এভাবে হযরত আলী (রা.)'র বাহিনী সিরিয়ান বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেদের জন্য ফুরাত নদী পর্যন্ত পথ তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। হযরত আলী সিরিয়ান বাহিনীকে ফুরাত নদী থেকে পানি নেওয়ার ঢালাও অনুমতিও দান করেন। সিরিয়ানরা হযরত আলীকে নিষেধ করেছিল, পানি নিতে বাধা দিয়েছিল; কিন্তু তিনি যখন নদীর নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করেন, তখন তাদেরকে পানি নিতে বাধা দেন নি, বরং অনুমতি দেন। আমীর মুয়াবিয়া গোঁ ধরেছিলেন যে, হযরত আলী যেন হযরত উসমানের হত্যাকারীদেরকে তার কাছে হস্তান্তর করেন। যখন লড়াই বেধে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হলে, তখন উভয় পক্ষের শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিরা কোনমতে পরিস্থিতি শান্ত করেন। ৩৭ হিজরির সফর মাসে যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে (ছোটখাটো) সংঘর্ষ হতে থাকে, কিন্তু উভয় পক্ষ সর্বমুখী যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা ভেবে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে থাকে। সন্ধি স্থাপনের সম্ভাব্য সকল সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে উভয় পক্ষ এই বিষয়ে একমত হয় যে, সম্মানিত মাসগুলোতে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি দেওয়া হোক; কিন্তু এই প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। সফর মাসের শুরুতে পুনরায় যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়। যখন যুদ্ধ কিছুদিন পর্যন্ত কোনরূপ চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়াই চলতে থাকে, তখন আমীর মুয়াবিয়ার মনোবল ভেঙে পড়ে। সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে হযরত আমর বিন আস আমীর মুয়াবিয়াকে বর্শার ফলায় ফলায় কুরআন শরীফ বেধে এই ঘোষণা করানোর পরামর্শ দেন যে, সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থানুসারে হওয়া উচিত। অতএব এমনটিই করা হয় যার ফলে হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। বৃহৎ সংখ্যক লোক বলে বসে, আল্লাহ্‌র কাছে সিদ্ধান্ত চাওয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এভাবে হযরত আলী তাঁর অগ্রসারির সেনাদলকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন আর যুদ্ধ থেমে যায়। হযরত আলী (রা.) -এর সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক আমীর মুয়াবিয়ার এ প্রস্তাব মেনে নেয় যে, উভয় পক্ষ একজন করে হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করবে আর এই দুই বিচারক সমিলিতভাবে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। ইতিহাস গ্রন্থে ঘটনাকে তাহকীম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যাহোক, সিরিয়ানরা হযরত আমর বিন আস (রা.)কে মনোনীত করে এবং হযরত আলী (রা.) হযরত আবু মুসা আশআরীকে নিযুক্ত করেন আর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার পর সেনাবাহিনী অবস্থানস্থলে চলে যায়। এটি ইবনে আসীর-এর ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি।

(আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬১-২০১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এসম্পর্কে লিখেছেন যে,

এ যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গীরা চতুরতা অবলম্বন করে বর্শার মাথায় পবিত্র কুরআন উঠিয়ে ধরে বলে, পবিত্র কুরআন যে সিদ্ধান্ত দিবে তা আমরা মেনে নিব আর এ উদ্দেশ্যে হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করতে হবে। একথা শুনে সেই নৈরাজ্যবাদীরাই যারা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল আর যারা তাঁর শাহাদাতের পর পরই নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য হযরত আলী (রা.)-এর দলে যোগ দিয়েছিল আর তারাই হযরত আলী (রা.)-এর ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং বলে, তারা সঠিক কথা বলছেন। আপনি সিদ্ধান্তের জন্য হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করুন। হযরত আলী (রা.) অনেকবার অস্বীকৃতি জানান কিন্তু তারা এবং কিছু সংখ্যক দুর্বল স্বভাবের মানুষ যারা তাদের ফাঁদে পড়ে যায়, তারা হযরত আলী (রা.) কে হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করার বিষয়ে বাধ্য করে। অতএব মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে হযরত আমর বিনুল আস (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত হন। এই তাহকীম আসলে হযরত উসমান (রা.) হত্যার প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছিল আর শর্ত ছিল, পবিত্র কুরআন অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার জন্য হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল। খুনি যে-ই হোক পবিত্র কুরআন অনুসারে তাদেরকে পাকড়াও শাস্তির আওতায় আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু আমর বিনুল আস (রা.) এবং আবু মুসা আশআরী (রা.) উভয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করেন, ভালো হয় যদি প্রথমে আমরা এ দু 'জনকে অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কে তাদের ইমারত থেকে অপসারণ করি। তাহকীম গঠিত হয় বা হাকাম নিযুক্ত হয় হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। কিন্তু এখানে যে দু 'জন হাকাম নিযুক্ত হয়েছিলেন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, প্রথমে দু 'জনকে পদ থেকে অপসারণ করতে হবে, এরপর অন্য কথা হবে। কেননা এ দু'জনের কারণেই সকল মুসলমান সমস্যাকবলিত; এটি ছিল তাদের দু 'জনের মনোভাব। এরপর মুসলমানদের স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্তের সুযোগ দিতে হবে যেন তারা যাকে চায় তাকে খলীফা বানাতে পারে। অথচ তারা একাজের জন্য নিযুক্তই হন নি। এ দু 'জন হাকাম বা বিচারক যেভাবে চিন্তাভাবনা করেছিল সেটি ছিল ভ্রান্ত কেননা তারা এ কাজের জন্য নিযুক্তই ছিলেন না। যাহোক এ দু 'জন এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেওয়ার জন্য একটি সাধারণ জনসভার আয়োজন করেন। এতে হযরত আমার বিনুল আস (রা.) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) কে বলেন, প্রথমে আপনি আপনার সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিন এরপর আমি ঘোষণা দিব। কথামত হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) ঘোষণা দেন যে, তিনি হযরত আলী (রা.) কে খেলাফতের পদ থেকে অপসারণ করছেন। এরপর হযরত আমর বিনুল আস (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, হযরত আবু মুসা (রা.) হযরত আলী (রা.) কে পদচ্যুত করেছেন আর তার এ কথার সাথে আমিও ঐকমত্য পোষণ করছি এবং হযরত আলী (রা.) কে খেলাফত থেকে পদচ্যুত করছি, কিন্তু মুয়াবিয়াকে আমি ক্ষমতাচ্যুত করছি না, বরং তার ইমারতের পদে তাকে বহাল রাখছি। হযরত আমর বিনুল আস (রা.) ব্যক্তি হিসেবে অনেক পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। কিন্তু হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এখন আমি এ বিতর্কের লিপ্ত হচ্ছি না যে, এ সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিয়েছিলেন? পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও তখন তিনি কোনভাবে মানুষের কথায় প্ররোচিত হয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তাই আমি এই বিতর্কে যাচ্ছি না; কিন্তু তার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। এই মীমাংসার পরে হযরত মুয়াবিয়ার সমর্থকেরা বলা শুরু করে, যারা বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন তারা আলীর (রা.)-এর পরিবর্তে মুয়াবিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন আর এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এই সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, বিচারক এ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয় নি আর তাদের এই সিদ্ধান্তও কুরআনের কোন নির্দেশের অধীনে হয় নি। তখন হযরত আলী (রা.)-এর সেই মুনাফেকস্বভাব সমর্থকরাই যারা বিচারক নিযুক্তির বিষয়ে চাপ দিয়েছিল চিৎকার চেঁচামেচি করে বলতে থাকে, তাহলে বিচারক কেন নিযুক্ত করা হয়েছিল যখন কিনা ধর্মীয় বিষয়ে কোন বিচারক হতেই পারে না? হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, প্রথমত এ বিষয়টি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, তাদের সিদ্ধান্ত কুরআনের বিধান অনুযায়ী হবে যার অনুসরণ তারা করেননি। অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী মীমাংসা করা হয় নি। দ্বিতীয়ত বিচারক তো তোমাদের জোরাজুরির ফলে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখন তোমরাই বলছ, বিচারক কেন নিযুক্ত করলাম! তখন তারা বলে, আমরা তো আপনাকে কথার কথা বলেছিলাম আর আমরা আপনাকে যা কিছু বলেছিলাম তা আমাদের ভুল ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো আপনি এ কথা কেন মেনে নিলেন? বিদ্রোহী ও মুনাফেকরা বলে, এর অর্থ হলো আমরাও পাপী সাব্যস্ত হলাম আর সাথে আপনিও। উভয়েই সমদোষে দোষী হয়ে গেছি। আমরাও ভুল করেছি আর আপনিও করেছেন। এখন আমরা তো আমাদের পাপের জন্য তওবা করে নিয়েছি, কাজেই এখন

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

আপনারও উচিত তওবা করে নেওয়া এবং এটি মেনে নেওয়া যে, আপনি যা কিছু করেছেন তা অন্যায় ছিল। তাদের দুরভিসন্ধি এটি ছিল যে, হযরত আলী (রা.) যদি অস্বীকার করেন তাহলে তারা একথা বলে তাঁর বয়আত থেকে বেরিয়ে যাবে যে, যেহেতু তিনি ইসলাম বিরোধী কাজ করেছেন তাই আমরা তাঁর বয়আতভুক্ত থাকতে পারি না। আর তিনি যদি তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নেন এবং বলেন, আমি তওবা করছি, তবুও তাঁর খেলাফত বাতিল হয়ে যাবে; কেননা যে ব্যক্তি এত বড় অপরাধ করে সে কীভাবে খলীফা হতে পারে? এসব কথা শোনার পর হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি কোন ভুল করি নি। যে বিষয়ে আমি হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করেছিলাম তা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয বা বৈধ। এছাড়া বিচারক নিয়োগের সময় আমি স্পষ্ট ভাষায় এই শর্ত রেখেছিলাম যে, বিচারক যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তা যদি কুরআন ও হাদীস সম্মত হয় তবেই আমি তা অনুমোদন করব, অন্যথায় কোনক্রমেই আমি সেটির অনুমোদন দিব না। তারা যেহেতু এই শর্তের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি আর তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত ও প্রদান করেন নি, কাজেই তাদের দেওয়া সিদ্ধান্ত আমার জন্য কোন দলিল হতে পারে না। কিন্তু তারা হযরত আলী (রা.)-এর এই যুক্তি মেনে নেয় নি আর বয়আত থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং খারেজী নামে অভিহিত হয়। এরপর তারা এ মতবাদের প্রবর্তন করে যে, আবশ্যিকভাবে আনুগত্যের যোগ্য বা অনুসরণীয় খলীফা কেউ নেই বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম সম্পাদিত হবে। কেননা কোন এক ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে আনুগত্য যোগ্য আমীর মেনে নেওয়া "লা হুকমু ইল্লা লিল্লাহ্" (অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নির্দেশ চলবে না)-এর পরিপন্থি।

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড ১৫, পৃ: ৪৮৬-৪৮৮)

হিজরী ৩৮ সনে নাহ্ রোয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নাহ্রোয়ান বাগদাদ এবং ওয়াস্তার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এ স্থানেই হযরত আলী (রা.) এবং খারেজীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনে আসীরের ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, সিফফীনের যুদ্ধের চুক্তির উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) এবং আমীর মু'আবিয়ার পক্ষে হযরত আমার বিনুল আস (রা.) বিচারক নিযুক্ত হন। ইসলামের ইতিহাসে ঘটনাকে তাহ্কীম বলা হয়। তাহকীম সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তাঁর সেনাদলের একটি গোষ্ঠি দ্বিমত পোষণ করে আর বিদ্রোহ করে পৃথক হয়ে যায় আর খারেজী নামে অভিহিত হয়। খারেজীরা তাহ্কীমকে অন্যায় আখ্যা দিয়ে হযরত আলী (রা.) কে তওবা করার এবং খিলাফতের আসন ছেড়ে দেওয়ার দাবি উত্থাপন করলে তিনি তা সরাসরি অস্বীকার করেন; কেন মেনে নেন নি তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) আমীর মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় সিরিয়ার সেনাভিযানের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় খারেজীরা বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। তারা আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবকে তাদের ইমাম বানায় এবং কুফা থেকে নাহ্রোয়ান অভিমুখে চলে যায়। খারেজীরা বসরাতেও তাদের দল সংঘবদ্ধ করে যা পরবর্তীতে নাহ্রোয়ান-এ আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবের সৈন্যদলের সাথে গিয়ে যুক্ত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন খাব্বাব (রা.)কে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ নেওয়ার জন্য হত্যা করা হয় এবং তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিরে খুবই নির্মমভাবে তাকেও হত্যা করে আর তাঈ গোত্রের তিনজন মহিলাকেও হত্যা করে। এ অবস্থার সংবাদ যখন হযরত আলীর কাছে পৌঁছায় তখন তিনি তদন্তের জন্য হারিস বিন মুর্রাকে প্রেরণ করেন। তিনি যখন তাদের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে যান তখন খারেজীরা তাকেও হত্যা করে। এ অবস্থা দেখার পর হযরত আলী (রা.) সিরিয়া যাত্রার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং প্রায় ৬৫ হাজার সেনা সম্বলিত বাহিনী যা সিরিয়া অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তাদেরকে নিয়ে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি যখন নাহ্ রোয়ানে পৌঁছান তখন খারেজীদের সন্ধির বার্তা প্রেরণ করেন এবং হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.)কে পতাকা দিয়ে বলেন, এর নীচে যে আশ্রয় নিবে, তার সাথে যুদ্ধ করা হবে না। এ ঘোষণা শুনে সেসব খারেজী যাদের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ছিল তাদের মধ্যে ১০০ জন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং একটি বড় সংখ্যার লোক কুফায় ফিরে যায়। শুধু ১ হাজার ৮০০ লোক আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব খারেজীর নেতৃত্বে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং হযরত আলী (রা.)-এর ৬৫ হাজার সেনার সাথে যুদ্ধ হয় যাতে সব খারেজী নিহত হয়। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী খারেজীদের সামান্য একটি অংশ বেঁচে যায় যাদের সংখ্যা ছিল ১০ জনেরও কম। হযরত আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনীর ৭ ব্যক্তি শহীদ হন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

হযরত আমরা বিনতে আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) যখন বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন তখন শেষ সাক্ষাতের জন্য তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত উম্মে সালেমা (রা.)-এর নিকট আসেন। তখন তিনি হযরত আলী (রা.)কে বলেন, আপনি আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ছায়ায় যাত্রা করুন। খোদার কসম! নিশ্চয় আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং সত্য আপনার সাথে আছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদেরকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (রা.)-এর অবাধ্যতার ভয় না থাকত তবে আমি আপনার সাথে যেতাম। কিন্তু খোদার কসম! এরপরও আমি আমার পুত্র ওমরকে আপনার সাথে প্রেরণ করছি, সে আমার দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট এবং আমার প্রাণাধিক প্রিয়। (আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৯)

যাহোক, এই স্মৃতিচারণ চলছে আর ভবিষ্যতেও অর্থাৎ আগামী সপ্তাহেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

আজও আমি পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। আলজেরিয়ার সম্পর্কে অবশ্য ভাল সংবাদ রয়েছে আর তা হলো বিগত দু'তিন দিনে দু টি ভিন্নভিন্ন আদালত মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত অভিযুক্ত অনেক আহমদীকে মুক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই ন্যায়পরায়ন জজদের পুরস্কৃত করুন। আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাপনার অন্যান্যদেরকে ও বিচার বিভাগকে সুবিচার করার সামর্থ দান করুন কেননা আহমদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের কিছু কর্মকর্তা এবং বিচারক যারা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিচ্ছে আর নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে; আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তাদের হৃদয়ের হিংসা বিদ্বেষ হতে মুক্ত হয়ে বিষয় দেখার তৌফীক দিন। আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে যাদের সংশোধন হওয়ার নয় আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তাদের শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং আহমদীদের জন্য পাকিস্তানেও শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

পাকিস্তানী আহমদী, পাকিস্তানে অবস্থানরত আহমদীরা বিশেষভাবে বেশি বেশি নফল আদায় ও দোয়ার প্রতি জোর দিন। এসব দোয়ার মাঝে রয়েছে, رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ - এই দোয়া অধিকহারে পাঠ করুন। اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ দোয়াটিও অনেক বেশি পাঠ করুন। ইস্তেগফার করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। দরূদ শরীফ পাঠের প্রতিও মনোযোগী হোন; আজকাল এর প্রয়োজন অনেক বেশি। আমি যেমনটি বলেছি, নফল ইত্যাদিও পড়ুন। আল্লাহ্ তাদের তৌফিক দিন আর দ্রুত সেখানকার অবস্থাও অনুকূল করুন।

আজও আমি নামাযের পর কয়েক জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। যাদের মাঝে প্রথম জানাযা হবেমোকাররমা হুমদা আব্বাস সাহেবার যিনি খায়েরপুর নিবাসী শহীদ মোকাররম আব্বাস বিন আব্দুল ক্বাদের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ২৯ ডিসেম্বর তারিখে ৯১ বছর বয়সে ঐশী নিয়তি অনুযায়ী তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তার পিতা ডাক্তার মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯২৬ সনে নিজের আহমদী সহপাঠীর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ স্ত্রীসহ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫১ সনের মে মাসে লাহোরে তার অর্থাৎ হুমদা সাহেবার বিয়ে হয়েছিল প্রফেসর আব্বাস বিন আব্দুল ক্বাদের সাহেবের সাথে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মওলানা আব্দুল মাজেদ সাহেবের পৌত্র ছিলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর স্ত্রী হযরত সৈয়্যদা সারাহ্ বেগম সাহেবার বড় ভাই প্রফেসর আব্দুল ক্বাদের সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১৯৭৪ সনে তার স্বামী প্রফেসর আব্দুল ক্বাদের সাহেবকে খায়েরপুরে শহীদ করা হয়েছিল। তিনি

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain, Bolpur, Dist-Birbhum

পরম ধৈর্য ধারণ করেন, কোন প্রকার অধৈর্য প্রদর্শন করেন নি এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকেন। তার স্বামীর শাহাদত হলে তার অ-আহমদী খালাতো ভাই সমবেদনা জ্ঞাপনসূচক পত্রে লিখেন যে, আব্বাস অনেক ভালো মানুষ ছিলেন, হায় তার মৃত্যুও যদি সঠিক পথে হতো! এতে হুমদা সাহেবা তাকে উত্তরে লিখেন যে, আমি গর্বিত, কেননা যে পথে আমার স্বামী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তা সঠিক পথ।

হুমদা সাহেবারই স্কুল জীবনের একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন, শফীকা সাহেবা, ঘটনাচক্রে যার সাথে পরবর্তীতে পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হক-এর বিয়ে হয়। একবার তার স্বামীর প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি অর্থাৎ জিয়াউল হক সাহেবের স্ত্রী বলেন যে, সবাই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে কিন্তু হুমদা (সাক্ষাতের জন্য) আসে না। একথা জানতে পারলে হুমদা সাহেবা বলেন, এমন এক ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের আমার কোন ইচ্ছা নেই যে কিনা আমার প্রিয় ইমাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। আর এরপর তিনি তার সাথে কখনো সাক্ষাৎ করেন নি।

মরহুমা বহু গুণের আধার ছিলেন। খুবই পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ছিলেন। উন্নত শিষ্টাচারের অধিকারিণী, খুবই পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। সর্বদা নামায ও রোযা খুবই আগ্রহের সাথে পালন করতেন। সন্তানদের মাঝেও এই অভ্যাস সৃষ্টি করেছেন। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে খুবই তৎপর ছিলেন। দান-দাক্ষিণ্য করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন। রমযান মাসে বহু লোকের জন্য নিজের ঘরে প্রতিদিন ইফতার করানোর ব্যবস্থা করতেন। খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক, প্রেম ও ভালোবাসা ছিল। নিয়মিত আমাকে নিজের হাতে চিঠি লিখতেন। অধিকাংশ সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠ করতেন এবং জামা'তের অন্যান্য পুস্তক ও আল-ফযল (পত্রিকা) জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত পাঠ করেছেন। ২০০৬ সনে তার ছোট মেয়ে ডাক্তার আমেরা সাহেবা সড়ক দুর্ঘটনায় দুই সন্তানসহ মৃত্যু বরণ করেন। এই শোকও তিনি খুবই সহসিকতার সাথে সহ্য করেছেন এবং ধৈর্যের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। সকল বন্ধু -বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতরা তার অগণিত গুণের কারণে তাকে ভালোবাসতেন। অ-আহমদী আত্মীয়দেরও তার সাথে খুবই ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রয়েছেন যারা আমেরিকা, কানাডা এবং নরওয়েতে বসবাস করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে, অর্থাৎ তার সন্তানদের এবং তাদের সন্তানদের তার পুণ্যকর্মসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন এবং মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবতী জানাযা ইরাকের অধিবাসী রিজওয়ান সৈয়্যদ নাঈমী সাহেবের, যিনি গত ১৩ নভেম্বর তারিখে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তার পুত্র মুস্তফা নাঈমী সাহেব লিখেন, আমার পিতা স্বপ্নে নিজেকে হযরত সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জিলানী সাহেবের কাছে দেখতে পান, যিনি আমার পিতাকে তার জুতা প্রদান করেন। আমার পিতা এই বলে তা নিতে দ্বিধা বোধ করেন যে, আমার কী যোগ্যতা আছে, আমি সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জিলানী-র জুতা পরিধান করতে পারি। কিন্তু সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জিলানী সাহেব জোর দিলে আমার পিতা জুতা পরে নেন। অতঃপর সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জিলানী (রহ.) এক ব্যক্তি ও তার জামা'তের প্রতি ইঙ্গিত করে আমার পিতাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর রেজওয়ান আমিনী সাহেব স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। কয়েক বছর পর এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে জামা'তের সাথে তার পরিচয় ঘটলে রেজওয়ান সাহেব বলেন, তিনি যে স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন- এর অর্থ তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন ছিল। আর দ্বিতীয় স্বপ্নে যে ব্যক্তি এবং যার জামা'তের প্রতি ইশারা করে শেখ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে বলেছিলেন- এর অর্থ খলীফাতুল মসীহ্ ও তার জামা'ত ছিল। সুতরাং তিনি ২০১২ সালে বয়আত করেন।

মরহুম অত্যন্ত পুণ্যবান, সৎ এবং নিজ আত্মীয় স্বজন ও দরিদ্রদের সাহায্যকারী ছিলেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল। দুর্বল স্বাস্থ্য এবং মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজ এলাকায় আহমদীয়াতের তবলীগ করতে থাকেন। নিজ বংশের সদস্যদের সর্বদা নসীহত করতে থাকতেন যেন তারা বয়আত করে (আহমদীয়া) জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পুত্র, সহধর্মিণী এবং সহধর্মিণীর ভাইও এখন বয়আত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অবিচলতা দান করুন এবং মরহুমের পুণ্যকর্মসমূহ চলমান রাখার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা সারগোধা জেলার মুকাররম মালেক আলী মুহাম্মদ হাজকা সাহেবের, যিনি কেনিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আফজাল জাফর সাহেবের পিতা ছিলেন। তিনি গত ২০ আগস্ট তারিখে ৯০ বছর বয়সে ঐশী বিধান অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন ।

১৯৭৪ সালে তিনি আল্লাহ্র পথে কারাবরণের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। জামা'তের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ওয়াকফে জিন্দেগী মুরব্বী ও মুয়াল্লেমদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন। মরহুম তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত; নামায ও রোযা পালনকারী, অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। দরিদ্রদের দেখাশোনা করতেন, ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতেন। একজন পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি অনেক শিশুকে কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার উত্তরসূরীদের মাঝে তিন পুত্র ও এগারোজন পৌত্র-পৌত্রী অন্তর্ভুক্ত।

তার এক পুত্র, আমি যেমনটি বলেছি, কেনিয়ার মুরব্বী সিলসিলা মুকাররম মুহাম্মদ আফজাল জাফর সাহেবকেনিয়ায় (কর্মক্ষেত্রে) থাকার দরুন পিতার জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্য ও সাহস দান করুন। মরহুমের সাথে তিনি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো লাহোরের শাফকাত মাহমুদ সাহেবের পুত্র ইহসান আহমদ সাহেবের। গত ২৭ জুলাই তারিখে ৩৫ বছর বয়সে করোনা ভাইরাসের কারণে তার মৃত্যু হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিনি গুজরাত জেলার গোলেকী নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন আজমল সাহেবের পৌত্র ছিলেন আর গুজরানওয়ালা নিবাসী ইরশাদ আহমদ সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। বিগত দু'বছর তিনি লাহোরের রচনা টাউন হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। এছাড়া তিনি দিল্লী গেট এমারতে সেক্রেটারী নওমোবাঈন হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি আটজনকে বয়আত করানোরও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দু'পুত্র স্নেহের হান্নান আহমদ মসরূর, বয়স ছয় বছর এবং স্নেহের মুবীন আহমদ তাহের, বয়স তিন বছর এবং এক কন্যা স্নেহের সায়েরা আহমদ, বয়স পাঁচ বছর, পিতা, মাতা, তিন ভাই ও দু'বোন রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন। তিনি স্বয়ং এই সন্তানদের অভিভাবক হোন আর তাদেরকে প্রয়াতের সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দান করুন এবং প্রয়াতের মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো মওলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব রিয়াজ উদ্দীন শামস সাহেবের। (তিনি) গত ২৭ মে তারিখে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

প্রয়াতের বংশ পরিচয় হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের প্রপৌত্র, হযরত মিয়া ইমাম উদ্দীন সিখওয়ানী সাহেবের পৌত্র, হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ সাহেবের দৌহিত্র এবং হযরত মওলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেবের পুত্র ছিলেন। তাঁরা সবাই সাহাবী ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তারশোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'কন্যা এবং এক পুত্র রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন। তার স্ত্রী পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। মরহুমের প্রতি তিনি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন এবং (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন। প্রয়াতের ভাই মুনীর উদ্দীন শামস সাহেব বলেন, মরহুম বহু গুণের আধার ছিলেন, নিয়মিত নামায পড়তেন, সন্তানদের সর্বদা নামাযের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। খিলাফতের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। বাড়িতে সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে আলোচনা হতো। অসুস্থাবস্থায়ও দু'বছর পূর্বে এখানে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন আর রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পরম ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল নিয়ে সানন্দে কথা বলতে থাকেন। কোন চিন্তা থাকলে তা ছিল সন্তানদের ঘিরে, নিজের জন্য কোন চিন্তা ছিল না। তার সম্পর্কে সবার অভিমত হলো, সর্বদা সকল অবস্থায় হাসতে থাকা আর সবার সাথে মিলেমিশে থাকা এবং সুখ-দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন আর (তার) মর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

জলসা সালানা জার্মানীর দ্বিতীয় দিন অ-আহমদী অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন:

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। আপনারা সকলে শান্তিতে থাকুন, সকলের উপর আল্লার কৃপা বর্ষিত হোক।

সর্বপ্রথম আমি অ-আহমদী অতিথিদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যারা আমাদের জামাতের সদস্য না হয়েও জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। আজ আমি ভাষণে ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.)-এর জীবনীর বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হতে পারে আপনারা এতে আশ্চর্য হবেন যে, আজকাল তথাকথিত অনেক মুসলমান পৃথিবীর শান্তি ধ্বংস করছে এবং নিজেদের সন্ত্রাসপূর্ণ পদক্ষেপকে কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর দিকে আরোপ করছে। একদিকে তারা নিতান্ত হিংস্রভাবে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে, অপরদিকে তারা এও দাবি করছে যে তাদের কর্মপন্থা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা একথা শুনে আরও আশ্চর্য হবেন যে, তথাকথিত এই মুসলিমরা, যারা নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে, তাদেরকে দেখে আমার এবং নিঃসন্দেহে প্রত্যেক আহমদীর ইসলামের উপর ঈমান আরও সমৃদ্ধ হয়। আপনি একথা জেনে হয়তো বিচলিতও হতে পারেন আর আশ্চর্যও হতে পারেন যে, অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসপূর্ণ কার্যকলাপ দেখে একজন আহমদী মুসলমানের ঈমান কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে! খুব সম্ভব এই কথাটি আপনাকে চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, আহমদী মুসলমানরাও অন্যান্য মুসলমানদের মতই, যারা উগ্রবাদের বিস্তার চায়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক প্রতিপন্ন হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই, আমি একথা স্পষ্ট করতে চাই যে, আহমদী মুসলমান পৃথিবীতে শান্তির প্রসারের চেষ্টায় পরম নিষ্ঠ আর তারা সব সময় চেষ্টা করে কেবল সেই কাজ করার যা তারা প্রচার করে। আমাদের বাহ্য ও অভ্যন্তরে মধ্যে কোনও বৈপরীত্য নেই। আমরা কেবল সেই সমস্ত শিক্ষা অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি, যেগুলিকে আমরা আন্তরিকভাবে ইসলামী শিক্ষা মনে করি। আমি এও স্পষ্ট করতে চাই যে, আহমদী মুসলমানেরা যখন শান্তি, নিরাপত্তা এবং সকলের জন্য ভালবাসার প্রচার করে, তখন তা কোনও নতুন বিষয় নয়, বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাই তারা প্রচার করে। ইসলাম সকল দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি, সমন্বয়, সহিষ্ণুতা এবং ভালবাসার ধর্ম। নিঃসন্দেহে এই ইসলামী শিক্ষার কারণেই আহমদী মুসলমানরা ধর্ম নির্বিশেষে সকল জাতির জন্য ভালবাসার চেতনায় উদ্বুদ্ধ আর কেবল ইসলামের কারণেই আমরা সমগ্র বিশ্বে প্রকৃত শান্তি চাই আর এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য এবং বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে আমি আপনাদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন রাখতে চাই না। অর্থাৎ একদিকে আহমদী মুসলমান অন্যান্য মুসলমানদের উগ্রবাদী কার্যকলাপের নিন্দা করে অপর দিকে একথাও বলে যে, এমন উগ্রতাপূর্ণ কার্যকলাপ তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করার কারণ হয়। এটিকে স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য আমি আপনাদেরকে ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.)-এর যুগে নিয়ে যেতে চাই। সেই যুগে আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যতের বিষয়ে এক অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুসলমানদের উপর আধ্যাত্মিক অমানিশার এক যুগ আসবে আর তারা সম্পূর্ণ ঈমানশূন্য হয়ে পড়বে। সেই যুগে মুসলমানদের কর্মধারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে। আঁ হযরত (সা.) এও বলেছিলেন যে, তথাকথিত মুসলিম উলেমা এবং নেতারা ইসলামী শিক্ষার অপব্যাখ্যা করবে। তাদের বুদ্ধি কেবল কলহ-বিবাদ এবং অন্যায় প্রসারে কাজে আসবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তথাপি মুসলমানদের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে আঁ হযরত (সা.) এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, এমন বিবাদ-বিশৃঙ্খলার যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনরুত্থান এবং এর প্রকৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য এক মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন, যাকে প্রতিশ্রুত মসীহ তথা ইমাম মাহদী হিসেবে প্রেরণ করবেন, যিনি ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও প্রকৃত শিক্ষাকে সমগ্র বিশ্বে কার্যকর করবেন। তিনি মানবজাতিকে ইসলামের প্রকৃত আধ্যাত্মিক আলোয় আলোকিত করবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আমরা খোদা তা'লার কৃপায় দেখতে পাচ্ছি যে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর দুটি অংশ পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ একদিকে ইসলাম এবং এর শিক্ষা মলিন হয়ে পড়েছিল আর অপরদিকে খোদা তা'লা জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর সত্তায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করেছেন। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর জীবনে ইসলামের প্রকৃত রূপ উন্মোচন করেছেন আর এর অসাধারণ শিক্ষাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মানব ইতিহাসে শান্তির সর্বমহান নেতা হলেন আঁ হযরত (সা.)। অতএব সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার কারণেই এই সব তথাকথিত মুসলমানদের ভয়াবহ কর্মপন্থা দেখে আহমদী মুসলমানদের ঈমান শক্তি লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই পরিচিতির পর আমি এখন আঁ হযরত (সা.)-এর সেই প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করতে চাই যা পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অনবদ্য প্রচেষ্টাকে প্রতিবিম্বিত করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একটি মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আঁ হযরত (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তা এই যে, পৃথিবীতে প্রত্যেকের মানসিকতা এবং অগ্রাধিকার ভিন্ন ভিন্ন। একথা সত্য যে, অধিকাংশ মানুষই শান্তিকামী। কিন্তু এও সত্য যে, অনেক মানুষ কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত শান্তি এবং নিরাপত্তাকেই প্রাধান্য দেয়। তারা অপরের সফলতা নিয়ে চিন্তা নাম মাত্র করে কিম্বা মোটেই করে না। মনঃস্তত্ব বিদ্যা থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যেখানে সুখে-শান্তিতে থাকতে চায়, কিন্তু অপরদিকে এটিও সত্য যে অধিকাংশ মানুষ এটা পছন্দ করে না যে তার শত্রু বা বিরোধী সুখে-শান্তিতে বসবাস করুক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথাও সত্য যে, মানুষ শান্তির বিভিন্ন প্রকারকে গুরুত্ব দেয়। যেমন, অনেকে কেবল আন্তরিক ও মানসিক শান্তিকে গুরুত্ব দেয়, কিছু লোক পরিবারের সুখ শান্তিকে গুরুত্ব দেয় আবার কিছু মানুষ প্রতিবেশীদের মাঝে শান্তির বাসনা করে। কিছু মানুষ নিজের কসবা, শহরের এবং কিছু মানুষ নিজের দেশের শান্তিকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু নিজেদের বিশেষ প্রবণতা ছাড়া তারা এ বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকে না যে অন্যান্য শহর এবং দেশে কি ঘটছে? পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বসবাসকারীরা যে বিপদ ও কঠোরতার মধ্যে আছে, সে বিষয় নিয়ে তারা কোনও সহানুভূতি ও ভালবাসা অনুভব করে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রাচীন যুগে এই অনুভূতিহীনতা ও উদাসীনতা কিছুটা হলেও মেনে নেওয়া যেত। কেননা, সমাজ ও জাতিসমূহের মাঝে এমন পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল না, যেমনটি একালে আছে। সেই যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত ছিল; একটি এলাকা এবং দেশের পরিস্থিতির সংবাদ অন্যান্য এলাকা বা দেশে পৌঁছনোর জন্য দীর্ঘ সময় লেগে যেত। আর অধিকাংশ সময় পৌঁছতে পৌঁছতে তা পুরোনো হয়ে যেত আর ততদিনে অবস্থা পাল্টে যেত। অতএব, সেই যুগে অন্যদের দুঃখ কষ্টকে তৎক্ষণাৎ অনুভব করা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের সহায়তা করার চেষ্টা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু আজকের পৃথিবীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, পৃথিবী আজ এক বিশ্বপল্লীতে পরিণত হয়েছে। যাইহোক পৃথিবী যেহেতু এখন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, ব্যবধান মিটে গেছে আর যোগাযোগ ব্যবস্থার বাধা দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু এখনও এই সত্যকে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

খোদাতালার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী।"

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

অস্বীকার করা হচ্ছে যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমন অনেকে বিশ্বাস করে যে মধ্য-প্রাচ্য কিম্বা আফ্রিকার অবস্থার কারণে ইউরোপ কিম্বা দক্ষিণ আমেরিকার অবস্থার উপর কোনও প্রভাব পড়ে না। অনুরূপভাবে অস্ট্রেলিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অধিবাসীদের অনেকের ধারণা, পৃথিবীর অন্যান্য অংশে যে যে বিবাদ-বিশৃঙ্খলা চলছে, যেমন- ইউক্রেন ও রাশিয়ার মাঝে বিবাদ- এগুলি তাদের জীবন এবং তাদের দেশের উপর কোনও প্রভাব ফেলে না। সাধারণত এমনটাই ধরে নেওয়া হয় যে, পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও বিবাদগুলি কেবল প্রভাবিত এলাকাগুলি পর্যন্তই সীমিত, বর্হিজগতে এর কোনও প্রভাব ছড়াবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথাগুলি একদিকে রয়েছে, কিন্তু এছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আচরণ ও চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি সেটি হলে অভিবাসন আর এর থেকেও ব্যপক গুরুতর সমস্যা হল দেশত্যাগীদের নতুন সমাজে সমন্বিত হওয়ার বিষয়টি। অনেক দেশে আমরা দেখছি যে অভিবাসীদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা ও হতাশা বেড়ে চলেছে। তাদের মধ্যে কিছু যুবক এতটাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা উগ্রপন্থার পথ বেছে নিয়ে উগ্রবাদী সংগঠনগুলিতে যোগ দিয়েছে। এর থেকে বস্তুত এক প্রকার ভীতি তৈরী হচ্ছে। কেননা, উন্নত দেশগুলি উপলব্ধি করছে যে, তাদের যুবক সম্প্রদায় ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছে আর এই বিষয়টি জাতির জন্য অনেক বড় বিপদ। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে উন্নত বিশ্বের দেশগুলি এবং আইন বলবৎকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এশিয়ার মানুষদের উপর এই আশায় নিষেধাজ্ঞা চাপাতে যাচ্ছে যে এর দ্বারা তাদের সমাজ ও বাসিন্দারা নিরাপদ হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। এমন গম্ভীর সমস্যার উপযুক্ত সমাধান নয়। এই সমস্যার পূর্ণাঙ্গীন সমাধান করা দরকার। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলছি যে ইসলামের নবী (সা.) আমাদের সামনে এই সমস্যাগুলির সমাধান তুলে ধরেছেন। তাঁর উজ্জ্বল শিক্ষামালার মাধ্যমে তিনি শান্তির স্বর্ণ চাবি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, কেবল জাগতিক পন্থা ও পার্থিব কামনা-বাসনার প্রতি মনোযোগ দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি অর্জিত হতে পারে না। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, মুসলিম হোক বা অমুসলিম, অরাজকতা থেকে রক্ষা পেতে এবং নিরাশা ও বিদ্বেষের আগুন থেকে রক্ষা পেতে কেবল একটিই মাধ্যম আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তিনি (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রকৃত শান্তি স্থাপনের জন্য মানবজাতিকে তার স্রষ্টাকে চিনতে হবে....। আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করেছেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমানেরা নিজেদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে বসবে আর খোদা তা'লাকে মোটেই গ্রাহ্য করবে না। তাদের ঈমান কেবল মৌখিক এবং বাহ্যিক দোয়া দরূদেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও খোদা তা'লার প্রকৃত পরিচয় করতে অপারগ হয়ে পড়বে। আর যারা কোনও ধর্মে বিশ্বাসী নয়, তারা খোদা তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে খোদা সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, তিনি সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সেই খোদা, যাঁর একাধিক গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হল 'সালাম'। অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। কুরআন করীমের সূরা হাশরের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে নির্দেশ দেন যে, তুমি পৃথিবীবাসীকে বলে দাও যে, তারা যেন সেই বাদশাহ, পবিত্র সত্তা এবং শান্তিদাতার প্রতি ঈমান আনে। 'সালাম' এর অর্থ সেই সত্তা যিনি পৃথিবীকে শান্তি দেন এবং সেই জ্যোতি যার থেকে শান্তির সমস্ত কিরণ বিকিরিত হয়। অতএব, সকল শান্তির উৎস হওয়ার কারণে খোদা তা'লা চান সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত থাকুক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যেভাবে মা-বাবা পছন্দ করে না যে তার সন্তানরা পরস্পর লড়াই করুক আর পরিবারে অরাজকতা সৃষ্টি করুক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা চান না, তাঁর সৃষ্ট জীব বিবাদ বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হোক। মাতাপিতা সবসময় তাদের সেই সন্তানদের পছন্দ করে, যারা নম্র ও শান্তিপ্রিয়। অনুরূপভাবে দেশের আইনও তাদেরকেই পছন্দ করে যারা শান্তি প্রিয়। অনুরূপভাবে আমাদের ঈমান, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা নিজেদের ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে আর শান্তি বজায় রাখে। আমরা যদি এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি তবে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সেই সব তথাকথিত মুসলমান যারা উগ্রতাপূর্ণ চিন্তাধারার অনুসরণ করছে, তারা নিজেদের এই দাবিতে সম্পূর্ণ মিথ্যা যেখানে তারা বলে যে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে সশস্ত্র জিহাদ এবং হত্যা ও হানাহানি করার আদেশ দেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এর যুগে যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলির মূল পটভূমি দেখা দরকার। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ইসলামের উন্মেষ লগ্নে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাহাবাদেরকে প্রবল বিরোধিতা এবং নির্মম অত্যাচার সহন করতে হয়েছিল। অনেক বছরের ধৈর্যের পর আঁ হযরত (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অমুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। এই অনুমতি কুরআন করীমের সূরা হজ্জের ৪০ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যেহেতু মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তাদের জন্য জবাব দেওয়া এবং আত্মরক্ষা করা ছাড়া যেহেতু আর কোনও পথ খোলা রাখা হয় নি, এই কারণে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যতদূর এ বিষয়টি সম্পর্ক যে জবাব দেওয়া কেন জরুরী ছিল, আল্লাহ্ তা'লা পরবর্তী আয়াতে এর উত্তর দিয়েছেন। সূরা হজ্জের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অত্যাচারী আক্রমণকারীরা মুসলমানদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে আর যদি সীমালঙ্ঘন কারীদেরকে পেশিবলে অন্যায় থেকে বিরত রাখা না হয়, তবে কেউই শান্তিতে থাকতে পারবে না। মুসলমানেরা যদি আত্মরক্ষা না করে, এর পর কোন ধার্মিক মানুষ কিম্বা অন্য কেউই শান্তি ও নিরাপদে থাকতে পারবে না। এই আয়াতেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি মুসলমানেরা আত্মরক্ষা না করত, তবে কোন গীর্জা, সীনাগগ, মঠ, মসজিদ কিছুই নিরাপদ থাকত না। অথচ মানুষ সেখানে কেবল খোদার স্মরণে, শান্তি প্রসারে এবং নিজেদের মন ও মস্তিষ্ক থেকে যাবতীয় অসৎ চিন্তাধারাকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। এই কারণে সীমালঙ্ঘনকারীদের হাত প্রতিহত করার যে অনুমতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন তা এই জন্য যে, যদি তা না দেওয়া হত, তবে সমস্ত উপাসনাগার ভূলুণ্ঠিত হত আর পৃথিবীর শান্তি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি কেবল অন্যায় ও অত্যাচারের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন। এই অনুমতি ছিল সেই সব লোকদের বিরত রাখতে যারা সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার হরণ করতে চাইছিল। এই অনুমতি ছিল সেই সব লোকদের প্রতিহত করতে, যারা ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিতকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। আর এই অনুমতি শুধুমাত্র ইসলামকে রক্ষা করতে দেওয়া হয় নি, বরং সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের নিরাপত্তার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এই আয়াত থেকে আমরা এই শিক্ষাও পাই যে, মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনাগারগুলি শান্তির আশ্রয় স্থল আর ভালবাসা প্রসারের জন্য নির্মিত হয়ে থাকে। কোনও প্রকারের উগ্রতা ও বিদ্বেষ ছড়ানো এগুলির উদ্দেশ্য নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এরপর সূরা আনফালের ৬২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) এর উপর অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন, যা মুসলমানদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়, এমনকি যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'যদি তোমাদের শত্রুরা শান্তি ও চুক্তির জন্য হাত বাড়ায়, তবে অবিলম্বে তা স্বীকার করে নেওয়া উচিত এবং এর পর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা উচিত। অতএব, আলোচনার প্রস্তাবে গম্ভীর নয় ধরে নিয়ে সন্দিহান হওয়া এবং শত্রুপক্ষ প্রতারণা করছে বলে অনুমান করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শিক্ষা দিয়েছেন যে, যতদূর সম্ভব মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব মুছে দেওয়া উচিত, এমনকি সেই সব মানুষের থেকেও যারা ধর্মহীন, খোদা তা'লাকে বিশ্বাস করে না আর ইসলামের বিরুদ্ধে

শত্রুতা পোষণ করে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, মুসলমানরা যেন পৃথিবীতে সমন্বয় বজায় রাখতে শান্তির প্রত্যেকটি সুযোগকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্ তা'লার আরও একটি নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করেছেন যা কুরআন করীমের সূরা হা-মিম-সিজদার ৩৫ নং আয়াতে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্দের জবাব পুণ্যের দ্বারা দেওয়া উচিত। এই নির্দেশের পেছনে যে প্রজ্ঞা রয়েছে, তা এই যে, কেউ যদি বিদ্বেষের জবাব ভালবাসার দ্বারা দেয়, তবে শত্রুতা ও বিদ্বেষের গভীরতা থেকে বন্ধুত্ব ও একতার জন্ম নিবে, ক্ষীণ হলেও, এমন আশা করাই যায়।

কি অপূর্ব শিক্ষা! নিঃসন্দেহে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আঁ হযরত (সা.) শান্তি, বোঝাপড়া এবং ভালবাসার শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। আমি সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটির উদাহরণ দিয়েছি, যেগুলি প্রমাণ করে যে, ইসলামের খোদা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সেই সত্তা যিনি নিজ সৃষ্টিজগতের জন্য শান্তি ও ভালবাসা চান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই জন্য যারা মনে করে যে, ইসলামের শিক্ষা উগ্রবাদ ও বিদ্বেষ প্রসার করে, তাদের উচিত মনের এই আশঙ্কা ও ভ্রান্ত ধারণা চিরতরে দূর করে নেওয়া। আজকাল আমরা যে নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ খুনোখুনি ও হানাহানি দেখতে পাই, সেগুলির অভিযোগ ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার উপর বর্তায় না, বরং এগুলি সেই সব তথাকথিত মুসলমানের অপকর্মের পরিণাম যারা স্বার্থলোভী এবং ঘৃণার প্রসারকারী। এরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে ইসলামের আত্মাকে কলুষিত করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে কেবল আহমদীয়া জামাতই পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করছে। এই কারণেই প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান, অ-মুসলিমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতে যোগদান করছে। তারা কেবল খোদা তা'লার ভালবাসা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং প্রকৃত শান্তি ও মানসিক প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে আহমদী মুসলমান হচ্ছে। এই আহমদীরা সেই সব আশাহত মানুষদের ন্যায় নয়, যারা নিজেদের ভাবাবেগ ও প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যার কারণে তারা উগ্রবাদী সংগঠনগুলির অংশ হচ্ছে এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে ইসলামের সুনাম হানি করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ যখন কিনা ইসলামকে সম্পূর্ণ এক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হচ্ছে, আমরা আহমদীরা হাল ছেড়ে দিই না, হতাশও হই না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা একদিন অবশ্যই সফল হব এবং পৃথিবীতে ইসলামের সূর্য উদিত হবে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মানুষ এই অপূর্ব সুন্দর শিক্ষাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন:এই কথাগুলি বলে আমি আপনাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের বক্তব্য শেষ কররছি। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা নিজেদের সময় বের করে এখানে আমার কথা শুনতে এসেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের উপর কৃপা বর্ষণ করুন। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া:

মরোক্কোর এক ভদ্রলোক মুস্তাফা জিন্নাহ সাহেব বেলজিয়াম থেকে জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এখানে এসে আমি যা কিছু দেখেছি ও অনুভব করেছি তাতে আমি আপ্লুত; আর মনের এই ভাবাবেগ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এমন আধ্যাত্মিক দৃশ্য দেখেছি যা আমার আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলেছে। ইসলামের সঠিক দৃশ্য আমি এখানে দেখতে পেয়েছি। আমি প্রায় দুই বছর থেকে জামাতকে জানি, কিন্তু গত তিন মাস থেকে নিয়মিত জামাতের অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করে দেখছি। যুগ খলীফাকে দেখে এবং তাঁর বক্তব্য শুনে আহমদীয়াত সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি পাল্টে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন বয়আত করার তৌফিক দিন যাতে আমি ধর্মের সেবক হয়ে উঠি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীতে প্রচারকারী হই।

বেলজিয়াম থেকে মরোক্কোর আরও এক ভদ্রলোক মহম্মদ লিয়াবি সাহেব জলসায় এসেছিলেন। তিনি বলেন: আমি এক বছর থেকে ব্রাসেলসের আহমদীয়া মসজিদের কাছাকাছি থাকি। প্রায় তিন মাস থেকে আহমদীয়াতের বিষয়ে অধ্যায়ন করছি। আমার ধারণা ছিল, আহমদীয়া অন্যান্য জামাতের মতই এক নতুন 'বিদাত'। আমি যতই জামাত আহমদীয়ার বই পুস্তক পড়লাম, আমার চিন্তাধারা ততই বদলে যেতে লাগল। কিন্তু আমি কখনও কল্পনা করি নি যে, আমি আহমদী হয়ে যাব। এখন আমি আন্তরিকভাবে আশ্বস্ত যে, এই সদাচার, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে জামাতের মধ্যে এই যে ভালবাসা রয়েছে, তা মানবীয় প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। যদি না এই জামাতের উপর খোদার হাত থাকে। আমি যখন খলীফাতুল মসীহকে দেখলাম, তখনই আমি বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা এখন আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকেও হিদায়াত দিন।

মরোক্কোর আরেক বন্ধু আব্দুল্লাহ্ কালনানি সাহেবও বেলজিয়াম থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন,'আমি বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের জলসাতেও অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু এমন কোনও জলসায় এই প্রথম অংশগ্রহণ করলাম যেখানে খলীফাতুল মসীহ অংশগ্রহণ করছেন। এই জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনা এমন মনে হয়েছে, যেন রানি মৌমাছির অধীনে সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এটি আমার সৌভাগ্য যে আমি এমন ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালবাসা এবং অসাধারণ ব্যবস্থাপনা দেখলাম যা পূর্বে আমি কখন কল্পনাও করি নি।

জলসার বক্তব্যগুলি দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছি, জ্ঞান বেড়েছে। জলসায় অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের কথাবার্তা শুনে আমার ঈমান অনেক সুদৃঢ় হয়েছে। খলীফাতুল মসীহর বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছিল যেন আমি আধ্যাত্মিক জগতে ডানা মেলে উড়ছি; যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছি, পৃথিবীর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। এই অবস্থা বর্ণনা করা আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ।

আডামাউ সিইডাও সাহেব বেলজিয়াম ও জার্মানী সীমান্তে বসবাস করেন। সেখান থেকে তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন: এক বন্ধুর মাধ্যমে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কিন্তু জার্মানীর জলসায় আসার পূর্বে পর্যন্ত আমি জামাত তথা ধর্মের বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে দেখতাম না। জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার ভাবাবেগের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। যে জামাতকে আমি গুরুত্বসহকারে দেখতাম না, সেই জামাতই আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট দিন দেখিয়েছে জলসা সালানা রূপে।

তিনি নিজের একটি স্বপ্ন বর্ণনা করে বলেন, 'এখানে জলসায় এসে আমি একটি স্বপ্নে দেখি, আমি সমুদ্রে আছি আর আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার হৃদয়ে শান্তি অবতীর্ণ হচ্ছে, সেই শান্তি এখন জেগে থাকা অবস্থাতেও আমি অনুভব করতে পারি। এই প্রশান্তি আমি জলসা সালানা জার্মানীতে আসার কারণেই লাভ করেছি। এই জলসা আমাকে একেবারেই পাল্টে দিয়েছে।

ওয়ালডিস স্টেইনস সাহেব ল্যাটিভা থেকে এসেছেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিকও ছিলেন আর ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনাও করতেন। এখন তিনি গবেষণা করছেন আর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বইপুস্তক লিখছেন। তিনি বলেন: আমি আজকে খলীফাতুল মসীহ্র যে ভাষণ শুনলাম তা থেকে অনুভব করলাম যে আমি একজন ছাত্র, যদিও আমিও তাই মনে করি আর এই দৃষ্টিভঙ্গিটি শান্তির জন্য জরুরী বলে মনে করি। আমি তওরাতও পড়েছি।মুসা (আ.) যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাও আমি পড়েছি। আমি এমন বিষয়ের সন্ধানেই ছিলাম।

ভদ্রলোক বলেন: আমি অনেক মনুষের সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ পেয়েছি।কিন্তু যখন খলীফাতুল মসীহকে দেখলাম, তখন মনে হল তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এমন মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি হয় না। তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে একপ্রকার প্রজ্ঞা, সত্য ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায়। আমি খুব তাড়াতাড়ি মানুষ চিনে ফেলি। খলীফা এক অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁর চিন্তাধারা অনন্য, তিনি যা বলেন তা সত্যই বলেন।

তুর্কির আটিলা কালিস্ক্যান নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আমি খলীফাকে প্রথমবার দেখবার সুযোগ পেলাম। তাকে দেখে অনেক স্নেহশীল বলে মনে হল। কোন কিছু ভাবনা চিন্তা না করেই মানুষ তাঁর উপর ভরসা করতে পারে। খলীফা যে কথাগুলি বলেন, তা কুরআন করীম এবং নবী করীম (সা.)-এর বাণী। অবশ্যই আমরা সেই সব শিক্ষা ভুলে বসেছি।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 4 Feb, 2021 Issue No.5

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ কোনও সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না, বরং তাঁর মধ্যে কোন এক অসাধারণ বিষয় আছে যা আমার জন্য ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সময় যদিও খুব কম ছিল,কিন্তু হুযুর আনোয়ার নিজের ভাষণে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাটি বর্ণনা করতে পেরেছেন। যা কিছু তিনি বর্ণনা করেছেন তা অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। হুযুর আনোয়ার পারস্পরিক সমন্বয় তৈরী করার শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন, সবাইকে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে, যাতে শান্তি পরিস্থিতি তৈরী করা যায়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত চেষ্টা করে যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যেন মানুষের কাছে পোঁছে যায়। এটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের কাজ।

দুইতিন জন ছাত্র জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: ইসলামের যে ভাবমূর্তি সংবাদমাধ্যম তুলে ধরছে তার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। কিন্তু আজ এখানে এসে এবং 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' তিলাওয়াত শুনে এবং খলীফার ভাষণ শুনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হলাম। আমি আজ জানতে পারলাম যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যা আঁ হযরত (সা.) বর্ণনা করেছিলেন তা এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। আজ আমি এও জানতে পারলাম যে, ইসলামের মধ্যে দুই প্রকারের চরমপন্থী আছে। এক দল জাগতিক কার্যকলাপে বেশি করে ডুবে আছে আর দ্বিতীয় প্রকার হল যারা বেশি চরমপন্থী। কিন্তু আজ আমি ইসলামের প্রকৃত রূপও দেখেছি যা এই দুইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আর সেটি হল জামাত আহমদীয়া।

ইতালি থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তিনি বলেন: আমি মসজিদ নববী সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেছি। এই জন্য ইসলামের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতে এদিকে জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। এখানে এসে তিলাওয়াত শুনে আমার বিশ্বাস জন্মাল যে এটিই প্রকৃত ইসলাম। এখন আমি ইসলামের বিষয়ে আরও পড়াশোনা করব।

ক্রোয়েশিয়ার দুইজন মহিলা সাংবাদিকও হুযুরের এই ভাষণ শুনেছিলেন। তারা বলেন: আজ আমরা তাঁর বক্তব্য শুনেছি, যা আমাদেরকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। এখানকার পরিবেশ ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। এখানে আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

বোসনিয়ার এক ভদ্রলোক বলেন: হুযুর আনোয়ারের ভাষণ অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। হুযুর আনোয়ার এক জীবন্ত খোদার ধারণা উপস্থাপন করেছেন। এই মুহূর্তে কেবল জামাত আহমদীয়াই এমন এক জামাত যারা দাবি করে এবং দেখিয়েও দেয় যে খোদা আজও জীবিত। এবিষয়টি হুযুর আনোয়ার অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় এবং চিত্তাকর্ষক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। আজ মানবজাতির এটিরই প্রয়োজন। আমার মনে হচ্ছে আপনারা অন্যদের থেকে আলাদা আর প্রকৃত ইসলাম কেবল আপনাদের মাঝেই রয়েছে।

খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী একজন শিক্ষক বলেন: আমি হুযর আনোয়ার ব্যক্তিত্ব দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। তাঁর প্রতি আমার অন্তরে অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে। তিনি এমন এক সত্তা যাকে রক্ষা করা আবশ্যক। পৃথিবীর অন্যান্য বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের ন্যায় তিনি খ্যাতি নিয়ে চিন্তিত বলে মনে হয় না। পোপকে দেখলে মনে হয় তিনি খ্যাতি উপভোগ করেন। কিন্তু খলীফার মধ্যে এই বিষয়টি দেখা যায় না। হুযুর আনোয়ার মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় তিনি মহিলাদের বিষয়ে যত্নবান, তাদের উন্নতির বিষয়ে তিনি চিন্তিত আর তিনি তাদেরকে সেই সব মূল্যবোধ শেখান যেগুলিকে রক্ষা করা প্রত্যেক মহিলার জন্য জরুরী।

তিনি বলেন: তাঁর তবলীগি ভাষণও অসাধারণ ছিল। আমি জেনেছি যে, প্রকৃত ইসলাম সেই ইসলাম নয় যা মিডিয়ায় দেখানো হয়। সব শেষে যে দোয়া ছিল তা আমার খুব ভাল লেগেছে। আমিও নিজের মত করে দোয়া করেছি।

ফ্রান্সের এক নবাগত আহমদী আনলী আনফান সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কোমোরোজ দ্বীপের বাসিন্দা। তিন সপ্তাহ পূর্বেই তিনি বয়আত করেছেন। তিনি বলেন: বয়আত করার পূর্বে আমি মুসলমান ছিলাম ঠিকই, কিন্তু অবিচলতা ছিল না। কাল হুযুর আনোয়ারের পেছনে জুমআ পড়ে আমি তৃপ্ত হয়েছি। আর জীবনে এই প্রথম নামাযে আমার কান্না আসে। জামাতে আসার পূর্বে আমার সমস্ত কাজ আটকে ছিল। কিন্তু যবে থেকে আহমদী হয়েছি, আমার সমস্ত কাজ সহজ হয়ে গেছে আর প্রতিদিন খোদার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছি।

আমি আহমদী হওয়ার পর সুখ ও আন্তরিক প্রশান্তি অনুভব করছি। জলসার পরিবেশ আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে জটিলতা ছিল, কিন্তু বয়আত করার পরের দিন থেকেই সব কিছু সহজসাধ্য বলে মনে হচ্ছে। এখানে আসার আগে একটি চাকরির প্রস্তাব পেয়েছি।

এখন জলসায় এসে আমার অনেক আশ্চর্য লাগছে যে এত মানুষ একই স্থানে এত সুসংবদ্ধভাবে বসে আছে। কোনও প্রকার ঝগড়া বিবাদ নেই, কোন কোলাহল নেই।

(১ম পাতার শেষাংশ.....)

মুসলমানেরা এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে নি। যে সময় ইসলামের প্রয়োজন ছিল কঠোর বৌদ্ধিক জিহাদের, সেই সময় তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিরা মুসাল্লা পেতে এবং তসবীহ হাতে নিয়ে বাড়িতে বসে থেকেছে আর সেই কর্ম থেকে

উদাসীন থেকেছে যা জাতিগত উন্নতির জন্য জরুরী ছিল। তাদের কাজ ছিল মুসলমানদের মধ্যে ব্যবহারিক শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করা, তাদের চরিত্র ও নৈতিকতায় সংশোধন নিয়ে আসা, তাদেরকে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি তৈরী করা। কিন্তু তারা এমনটি করে নি। পরিণামে, তাদের নামায ও রোযা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে নি। কেননা, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল, 'পুণ্যকর্ম' এর পরিণামে সফলতা পাওয়া যায়। এদের কর্ম যদিও ধর্মীয় বিধানসম্মত ছিল, কিন্তু সময়োপযুক্ত ছিল না। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার আইন অমান্য করার কারণে তারাও এবং অন্যান্য মুসলমানেরাও ক্ষতির সম্মুখীন হল। "

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

'দাফ' বা এক তালের ঢোল বাজিয়ে বিবাহের ঘোষণা দেওয়া বৈধ । কিন্তু এর মধ্যে যখন নাচগান প্রভৃতির সংমিশ্রন হয়, তখন তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"যে বিষয়টি মন্দ সেটি অবৈধ আর যে বিষয়টি পবিত্র সেটি বৈধ। খোদা তা'লা কোন পবিত্র জিনিসকে হারাম বা অবৈধ আখ্যায়িত করেন না। বরং সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল বা বৈধ। কিন্তু যখন পবিত্র জিনিসের মধ্যে নোংরা ও অপবিত্র বস্তু মেশানো হয়, তখন তা অবৈধ হয়ে যায়। যেমন 'দাফ' বা এক তালের ঢোল বাজিয়ে বিবাহের ঘোষণা দেওয়া বৈধ । কিন্তু এর মধ্যে যখন নাচগান প্রভৃতির সংমিশ্রন হয়, তখন তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদি সেভাবেই বাজানো হয়, যেমনটি নবী করীম (সা.) বলেছেন তবে এটা অবৈধ নয়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৪)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir